চাওয়া পাওয়া

বিমল মিত্র

কথা-কলি
৯/৩ টেমার লেন,
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :—
শ্রীসুশান্তকুমার সাহা
বেলেঘাটা, কলিকাতা-১০

প্রথম প্রকাশ,
শুভ ১লা বৈশাখ, ১৩৬০

মুদ্রক :—
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স
৫৭/এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন,
কলিকাতা-৬

চাওয়া পাওয়া

॥ এক ॥

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল মালা।

ঘড়ির দিকে তাকাল। বেলা তখন প্রায় পাঁচটা বেজে গেছে।

অত্যন্ত ক্লান্ত মালা। সারা দিন তার কেটেছে অজস্র কাজকর্মের মাঝ দিয়ে, একটুও বিশ্রাম সে পায়নি।

চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ অতি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা রাখল। মুখে সামান্য জল দিয়ে ভাল করে মুখটা মুছল।

আয়নার সামনে দাঁড়াল। সত্যি, আজ যা খাটুনি গেছে, তা যেন বড় বেশি।

কিন্তু—এমন খাটুনি আর বেশি তাকে অবশ্য খাটতে হবে না। কারণ মালা জানে, তার খাটুনির দিন ক্রমশঃ কমে আসছে।

এর পর সে পাবে বিশ্রাম।

বিশ্রাম?

কথাটা ভাবতেই মাথার মধ্যে যেন তার কেমন করে ওঠে হঠাৎ।

বিশ্রাম করবে সে কি নিয়ে? কাকে নিয়ে? কিভাবে?

কথাটা ভাবতেই মনের মধ্যে যেন পাক খেয়ে ওঠে তার?

ধীরে ধীরে ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দেয় ইজিচেয়ারের বুকের ওপর।

হঠাৎ তার নজর পড়ে দরজার দিকে।

মালা সোজা হয়ে উঠে বসে।

—তুমি?

তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

দরজায় দাঁড়িয়ে যে পুরুষটি, তার বয়স ত্রিশের দু এক বছর বেশিই হবে। গায়ে হ্যাণ্ডলুমের পাঞ্জাবী—পরনে পাজামা।

—ভেতরে এসো।

আবার বলে মালা।

প্রশান্ত প্রবেশ করে ভেতরে।

—চম্‌কে উঠলে নাকি ?

ধীরকণ্ঠে প্রশান্ত বলে।

—না।

—তবে, আশা কর নি ?

—তা বলতে পার। তোমার মনকে আমি আর কতটুকু চিনতে পারলাম ?

—আজও বলছো পারনি ?

—সত্যি—আজও নয়।

—কখন ফিরলে ?

—এইমাত্র। বড় জোর দু'তিন মিনিট।

—তা ত দেখছি—খুব পরিশ্রান্ত তুমি, তা ত বুঝতেই পারছি।

—বুঝেছো ?

—সেটা বোঝা কি খুব কষ্টকর ?

—ভ, না নয়। কি হলো, দাঁড়িয়ে কেন ?

প্রশান্ত বসল অন্য একটা চেয়ারে।

—তোমাকে অসময়ে বিরক্ত করলাম ত ?

—না, না, তা নয়। কি খাবে ?

—কিছু না ? তুমি শ্রান্ত—তুমি খাও ?

ঘরে ঢুকল ঝি রমা। বললে—দিদিমণি, কি খাবে এখন ?

—দু গ্লাস লিমন সরবৎ নিয়ে আয়।

—আমি আবার কেন ?

বাধা দিল প্রশান্ত।

—গরমে এসেছো। এক গ্লাস সরবৎ খারাপ লাগবে না।

—বেশ বলো। তবে একটা কথা -

—কি ?

—সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। এক প্যাকেট চারমিনার আনতে দাও। বলে পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে দিল প্রশান্ত।

—আজকাল চারমিনার খাও বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—কেন ? আগে ত গোল্ড ফ্লেক খেতে।

—পয়সা কোথায় ?

—তোমার পয়সার অভাব! ইউ ব্রুট্!

মালা হাতব্যাগ থেকে একটা দুটাকার নোট বের করে দিয়ে বললে—রমা, এক প্যাকেট গোল্ড ফ্লেক এনে দাও।

রমা চলে গেল।

মালা বললে—বিয়ের পর তুমি যখন গোল্ড ফ্লেক খেতে, তখন কি সুন্দর গন্ধ বের হত। তোমার চেহারার মধ্যে যেন একটা পৌরুষোচিত দৃঢ়তা ফুটে উঠত। অথচ তুমি যে এভাবে এত বেশী হতাশাবাদী হয়ে পড়বে, তা আমি ভাবতে পারি না।

—আমি হতাশাবাদী ?

—নিশ্চয়।

—এ কথা বলার মানে ? জান, এখনো আমি তোমার কাছে কখনো হাত পাতি না। নিজে যা সামান্য পাই দুটো টিউশনি করে আর মাঝে মধ্যে দু চারটে লিখে তাতেই নিজের সব খরচ চালাই।

তুমিই ত জোর করে একবার পথের মাঝে দেখা হবার সময় পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিলে।

—ও সব আজকাল চলে ?

—ও সব মানে ? তরল পানীয় ?

—হ্যাঁ—তাই ত বলছি।

—সে ঠিক নিয়মিত চলে। টাকাটা কোত্থেকে যেন ঠিক এসে যায়। তবে সে ত দিশি জিনিস কিনা। কত আর লাগে।

—ভাল। কিন্তু তাতে চেহারাটা কি এমন কিছু উন্নত হয়েছে ?

—তা হয়নি। দেহের উন্নতি ত এতে হয় না—হয় মনের।

—তার মানে ?

—মানে সাময়িকভাবে কনসেনট্রেশন বেড়ে যায়। তার ফলে অনেকটা লেখা যায় এক নিশ্বাসে।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ, সত্যি বলছি। তা ছাড়া তোমার কাছে কখনো ত মিথ্যা আমি বলি না।

—ভাল কথা। শুনে সুখী হলাম। তা তোমার প্রথম সেই বৃহৎ উপন্যাসটির লেখা কতটা হলো ?

—শ দুয়েক পাতা হয়েছে। মোট প্রায় সাত আট শো পাতা না হলে একটা উপন্যাস সার্থক হয় না। একটা যুগযন্ত্রণার প্রকাশ ত তুলে ধরতে হবে একটা উপন্যাসে।

—এ তোমার বিচিত্র কথা! আমি দেখেছি ত শারদীয় সংখ্যাতে এক একজন লেখক তিন চারটে করে উপন্যাস লেখেন।

প্রশান্ত হাসে। বলে—সেগুলো উপন্যাস নয়—ঐ নাম দেওয়া হয়।

—তার মানে ?

—মানে উপন্যাস শিরোনামা হলেও সেগুলো আসলে সাধারণ গল্প বা বড় গল্প। তাও অধিকাংশ সার্থক হয় না। উপন্যাস একজন লেখক সারা জীবনে দু একখানার বেশি লিখতে পারেন কিনা সন্দেহ। লুট হাসমুনের 'গ্রোথ অব দি সয়েল' বা তারাশংকরের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' এমনি দু একখানা। এমন বহু লেখক আছেন, যারা সারা জীবনে অনেক উপন্যাস লিখেছেন বলা হয়—কিন্তু তাঁরা আসলে একটিও উপন্যাস বলতে যা বোঝায় তা লেখেননি। রোমাঁ্যা রোল্যা সারা জীবনে মাত্র একখানাই 'জঁ৷ ক্রিয়স্তক্' লিখতে পেরেছেন।

—বুঝলাম এবার। কিন্তু তুমি উপন্যাস একটা লেখো ঠিক—তবে তার সঙ্গে ঐ রকম দু দশটা অন্য বই লিখতে ক্ষতি কি?

—তুমি জান মালা, যা লিখে আমার ভাল লাগে না, তা আমি ছিঁড়ে ফেলি।

—তা জানি।

—কেন বল তো?

—তুমি মনঃপুত না হলে সে লেখা ছাপাতে দিতে চাও না।

—ঠিক তাই। তাই আমার এই সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনে মাত্র গোটা পনেরো কুড়ি ছোট গল্প ছাড়া আর কিছুই ছাপা হয়নি।

—তাও ত শুনেছি।

—এর কারণ কি জান?

—না।

—কারণ, রচনা যদি অসার্থক ছাপা হয়, তা হলে অনেক সময় তার বাহুল্যের ভিড়ে ভাল রচনা যা দুচারটে লেখা হয়, তা হারিয়ে যায়।

—তা হতে পারে। আমি অতশত বুঝি না। বুঝলে ত আমি সাহিত্যিকই হয়ে যেতাম।

—তার চেয়ে ত তুমি কিছু কম নও। সাহিত্য যেমন আর্ট অভিনয়ও একটা কলা। আর তা ফোটাতে হলে তার জন্যে সাধনা চাই।

—হয়তো তাই—

—আর এই ফিল্মে অভিনয় বিশ্বের একটা চরম বিস্ময় ছাড়া কি?

—কেন?

—নাটকে অভিনয়ে পর পর অভিনয় করা হয়—একটা পারম্পর্য থাকে—একটা যোগাযোগ থাকে। একটা ইমোশন আসে। কিন্তু এই যে সিনেমাতে অভিনয়—এটা অভিনয় নয় কি?

—অভিনয়?

—নিশ্চয়।

—কেন?

—কোন্ দৃশ্যের পর কোন্ দৃশ্য আসবে তার কোনও স্থিরতা নেই। হয়তো শেষ দৃশ্যটা হলো প্রথমে—তারপর মাঝে একটা দৃশ্য তারপর দ্বিতীয়। এইভাবে উল্টোপাল্টা যে তোলা হয় তাতে ঠিক ভাব ফুটিয়ে তোলা কি কঠিন কাজ নয়?

মালা হাসে।

—হাসলে যে?

—এটা কঠিন নয় তেমন।

—কেন?

প্রধানতঃ ডিরেক্টার ত একটা আইডিয়া দেন।

—তা দেন ঠিকই। তবে তা কতটুকু?

—তা ছাড়া গোটা পনেরো কুড়ি বাঁধা অভিব্যক্তির একটা ছক মোটামুটি তৈরী করা থাকে মনে মনে। যেমন ভয়, বিস্ময়, ক্রোধ, বিরক্তি, আনন্দ, বিনীতভাব, উদারভাব এই রকম আর কি! কেবল ঠিক সময় মত সেটা ফুটিয়ে তোলা—এই যা কাজ।

—এটা ত মন্দ বুদ্ধি নয়। যাক্ সে কথা। আজ কটা কাজ ছিল ?

—উঃ প্রচণ্ড কাজ গেছে। সকাল সাতটাতে সামান্য চা জল খাবার খেয়ে বেরিয়ে দুটি ঘণ্টা কাজ। তারপর সেখান থেকে সোজা ষ্টুডিও। আবার রং মেখেই দ্বিতীয় ছবিটিতে তিনঘণ্টা কাজ। তারপর রঙ তুলে ষ্টুডিওতে খেতে আসা, ষ্টুডিওতে দু ঘণ্টা তৃতীয় ছবির কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরলাম।

প্রশান্ত হাসল।

—তাও কম কঠিন কাজ নয় মালা। এক জায়গায় হয়তো বীররস, তার পরেই আর এক জায়গায় হয়তো করুণরস—সত্যি বিচিত্র তোমাদের সিনেমা জগৎ।

মালা বললে—নিশ্চয় তাই। এটা হলো বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইণ্ডাষ্ট্রি।

—তা ত শুনেছি অনেকবার। তাই মাঝে মাঝে তোমার কথা ভেবে মনে গর্ব হয় মালা।

—গল্প ত লেখো মাসে দু তিনটে বড় জোর। আর ছেলে পড়াও গোটা দুয়েক। বাকি সময় কাটাও কি করে ?

—মাঝে মাঝে বই পড়ি। মাঝে মাঝে আবার সিনেমাও দেখি।

—সিনেমা দেখো ? আগে ত দেখতে না ?

—আগে ত জীবনটাই সিনেমা ছিল। এখন ত আর তা নেই।

—তা বটে

—কিন্তু সিনেমাতে গিয়ে প্রায়ই নির্বোধ গল্প দেখে ঘুম আসে। দু একটা ভাল গল্প অবশ্য শেষ পর্যন্ত দেখি। তোমার একটা ছবি সেদিন দেখলাম।

—কেমন হয়েছে অভিনয়?

—অভিনয়ে কৃতিত্ব তো কিছু নেই। যা করেছো, তা সাধারণ অভিনয় বলা যায়। তবে পরিচালক আর ক্যামেরাম্যানের কৃতিত্ব আছে। যাক্‌গে, তোমাকে অনেক বিরক্ত করলাম। এখন যাও—কিছু খেয়ে নাও।

—কি আবার খাব এখন? এত অবেলায় কিছু খেতে ভাল লাগছে না আমার। দুপুরে ত খেয়ে এসেছি।

মালা ডাক দেয়—রমা?

রমা আসে।

মালা বলে—কি করেছিস বিকেলের জন্যে?

—সাধারণ রান্না। কড়াইশুটির কচুরি, মাছ ভাজা আর কফি।

—দু প্লেট নিয়ে আয়।

রমা চলে গেল।

প্রশান্ত বললে—আমি আর এখন কেন অনর্থক।—

—চুপ করো ত! দুপুরে কটায় খেয়েছিলে?

—সে ত বেলা এগারোটায়।

—এখন কটা বাজে?

—প্রায় পাঁচটা—

—তা হলে কি শোনাবে যে ক্ষিদে নেই—

—তা নয়।

—তবে?

—মানে বিকেলে ত শুধু মুড়ি আর গুড় খাই। তাই এত ভাল খাবার হয়তো সহ্য হবে না।

—একদিন তাই চলুক না।

প্রশান্ত কোনও কথা বললে না। রমা সিগারেট দিয়ে গেছিল সে একটা সিগারেট ধরাল।

॥ দুই ॥

একটু পরে খাবার এলো।

খেতে খেতে প্রশান্ত বললে—অনেক দিন পরে আজ যেন কেমন একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে। তাই নয় কি?

মালা বললে—তা ত হবেই। এ জীবন ত আমাদের ঠিক এমনি থাকতো। কিন্তু তোমার জন্যেই ত—তুমি বিনা কারণে কেন যে এভাবে আমাকে এই নিষ্ঠুর দুর্বিপাকের মধ্যে ফেললে—

প্রশান্ত বললে—বাদ দাও ও কথা।

—বাদ দেব?

—হ্যাঁ। বরং বল বুলু কেমন আছে?

—বুলুর কথা এখনো তোমার মনে আছে?

—থাকবে না। হাজার হলেও সেই ত আমাদের একমাত্র সন্তান। আমাদের মেয়ে।

—তুমিই ত তাকে দিয়ে এলে বোর্ডিংয়ে।

—ভাল করিনি?

—তা করেছ। এখানে একা থাকতে পারতো না। তার চেয়ে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে বেশ ভুলে আছে।

মালা উৎসাহিত হলো। বলল—ওর শেষ ফটোটা দেখবে? মাত্র এক মাস আগে তোলা।

—তুমি গেছিলে?

—বারে, প্রতি মাসেই ত দুবার যাই। দেখা করে আসি। কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—ও প্রায়ই তোমার কথা বলে। তুমি কেন ওকে দেখতে যাও না। তুমি কেন এ বাড়ীতে থাকো না। এইসব নানা প্রশ্ন। আমি অনেক কষ্টে এড়িয়ে যাই।

মালা ফটোটা বের করে দেখাল। প্রশান্ত বললে—বেশ বড় হয়ে উঠেছে।

—হবে না? আট বছর পার হলো—নয়ে পড়বে। কিন্তু এত বাড়ন্ত, দেখায় ঠিক যেন দশ এগারো।

—পড়াশুনা করছে?

—হ্যাঁ, প্রত্যেকবারে ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হয়। দিদিমণিরা খুব ভালবাসেন। একটা কথা—

—কি?

—তুমি ত চাকরি করছো না। তাই—

—করছি না নয়, পাচ্ছি না। চেষ্টা ত আমি কম করিনি, তা জান।

—সব জানি।

—আসলে চাকরি পাবার যেটা খুঁটি তাই আমার নেই। তাছাড়া নেই তেল দেবার জোর। তাই চাকরি হবে কি করে বল?

—তা বটে। যাক সে কথা—তুমি বুলুকে পড়াবার ভার নাও না। মাসে একশো টাকা দেবো। এটাও ত একটা চাকরি। তাহলে বুলুকে এখানে এনে রাখি।

—তা ভাল নয়।

—কেন?

—এখানে ঐ তোমার শতদলবাবু আসবেন। আরও সব প্রোডিউসার। ওদের সামনে দেখলে ওর মনের ভাবটা পাল্টে যাবে। তার চেয়ে ও বেশ ভালই আছে বলতে পার।

—কিন্তু আমার দিন কাটে কি করে বল ?

—যেমন ভাবে কাটাচ্ছো।

—এভাবে আর কদিন কাটবে। সাতাশ আটাশ বয়স হলো। মেকাপ দিয়ে আর বড় জোর চার পাঁচ বছর চলবে। জানো, এককালের বড় বড় সব নায়িকারা আজকাল সামান্য মায়ের পার্টের জন্যে ষ্টুডিওতে গিয়ে ধর্ণা দিয়ে বেড়ায়।

—তা ত শুনেছি। পড়েছি ফিল্ম কাগজে।

—তুমি ফিল্ম কাগজ পড় ?

—পড়ি না, পড়তে বাধ্য হই। ফিল্ম কাগজে ফিল্‌মের সঙ্গে সঙ্গে কিছু ভাল ভাল লেখকের বা আমাদের ভাল গল্পও ছাপে কি-না। তাই ঐ সব পত্রিকার ফ্রি কপি পাঠায়। তাই যখন কাজ থাকে না চোখ বুলোই।

—তুমি ত ভাল বই ছাড়া পড়তে না আগে।

—এখনো পড়ি না। সে পড়া গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়া, বুঝলে। অন্যান্য শুধু চোখ বুলোনো।

—যাই হোক, আমি আর বছর চারের মধ্যেই ফিল্‌ম ছেড়ে দেব। আর তুমি বললে আজও ছাড়তে পারি। কি দরকার ? যা প্রয়োজন তার অনেক বেশি ত হয়ে গেছে।

—কত হলো ?

—ধরো এই বাড়ি, নিজের গাড়ি, তাছাড়া ইনকাম ট্যাক্স দিয়ে আর ফাঁকি দিয়ে মোট লাখ চারেক টাকা। তুমি জান না—ঐ কোণের সিন্দুকে ব্ল্যাক মণি এক লাখ ক্যাশ আছে। ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে খুন করে নিয়ে যেতে পার।

প্রশান্ত হাসল হো হো করে।

—হাসলে যে ?

—কারণ খুন করতে হবে কেন ? ও টাকা বা ওর যে-কোনও অংশ ত আমি চাইলেই পাই। তুমি ত কতবার বলেছো। আমি কি তা নিতে চেয়েছি ?

—না চাওনি। কিন্তু কেন ? কেন ?

—কারণ আমার আদর্শ আমার সাধনা যে পৃথক !

—তবে একটা কাজ করো।

—কি কাজ ?

—তোমার বিখ্যাত উপন্যাসখানা শেষ করে তুমি প্রকাশ করো। টাকা আমি দেবো যা লাগে। লাভ যা হবে আধাআধি।

—কিন্তু আজও যে অনেকটাই হয়নি। এত আর সস্তা ফিল্ম স্টোরী নয়।

—তা জানি। তবে এটা ঠিক, ও বই বের হলে বাংলায় তোমার স্থায়ী নাম হবে।

—তাইত এটা ছাপতে হবে ঠিক তেমনি করে। যে ভাবে লেখা চলছে ঐভাবেই চলবে। তার চেয়ে তুমি একটা কাজ করো না।

—কি কাজ ?

—তুমি একটা বিয়ে কর আবার। আমাদের ডিভোর্স ত পাকাপাকিভাবে করে নিয়েছি।

—তুমি কি পাগল ?

—তার মানে ?

—বিয়ে কি মেয়েদের দু বার হয় ?

—আজকাল ত হচ্ছে।

—আজকাল ত অনেকে অনেক কিছু ধর্মবিরোধী কাজ করছে —বলছে—এটাই নাকি মডার্ণইজম। ধর্ম হলো কুসংস্কার।

আমি মনকে অতটা উঁচু বা নিচু করতে পারিনি। আমার মতে ধর্ম সমাজকে ধারণ করে থাকে। কুসংস্কার কিছু থাকে বটে—তবে সবটা নয়। তাছাড়া আবার বিয়ে মানে আর একটা পুরুষের সঙ্গে এক বিছানায় শোয়া—ছি, তা কল্পনা করতেও আমার গা বমি বমি করে।

—তবে দিন কাটাবে কি করে?

—কাটবে, যেমন কাটছে।

—ভাল কথা। আজকের মত তাহলে উঠি—

—এত তাড়া কিসের বলো না। বেশ ত বসে আছো। তুমি থাকো কোথায়? ঠিকানা দাও না কেন?

—থাকি একটা নেহাৎ একতলা ভাড়া করা খুপরীতে। তোমার টালিগঞ্জের বাড়ী থেকে বাসে যেতে মাত্র দশ মিনিট লাগে। ঠিকানা দিই না, কারণ তোমার যা মন করে হয়ত গিয়ে হাজির হবে।

—তাতে দোষ কি? স্বামীর কাছে কি স্ত্রী যায় না?

—আইনতঃ ত এখন আমরা স্বামী-স্ত্রী নই।

—সেটা তুমি আমাকে ত্যাগ করেছো—আমি ত মন থেকে তা করতে পারিনি! তুমি যে শতদলবাবুদের কথা মানে প্রোডিউ-সারদের কথা বলছিলে তারা জানে আমি কিরকম পিউরিটান। যে নায়িকা কোনও প্রোডিউসারের সঙ্গে প্রেম করে না, জীবনে একফোঁটা মদ ছোঁয় না, বাড়ীতে আজ পর্যন্ত একটা ককটেল পার্টি দিল না—তাদের সম্পর্কে ওরা অনেক জল্পনা-কল্পনা করে। কম করে চার পাঁচজন আমার পাণি প্রার্থী।

—কে তারা?

—প্রথমে ধরো শতদল—বেচারা অবিবাহিত। তাই তার শখ হতে পারে, কিন্তু বিমানবাবু বলে কি-না তার বউকে সে ডাইভোর্স করতে পারে আমার জন্যে। আমি তাকে কি উত্তর দিয়েছি জান?

—কি ?

—বলেছি যে পুরুষ একবার বিয়ে করতে যায় তাকে বলে বর—আর যে বার বার বিয়ে করতে যায় সে হলো বর্বর।

—বাঃ, বেশ বলেছো ত ?

—তারপর শোনো—এই বিপত্নীক পঁয়তাল্লিশ বছরের অমিয় তালুকদার। তার তিন ছেলেমেয়ে। সেও বিয়ে করতে চায়। লাখ বারো চৌদ্দ টাকা আছে কি-না। আমার ধারণা কি জান ?

—কি ?

—অধিকাংশরা আমাকে বিয়ে করতে চায় টাকার লোভে। তবে ঐ অমিয় বুড়ো চায় শেষ জীবনে একটু আনন্দ পেতে।

—তাছাড়া বৃদ্ধ বয়সের জন্য একজন সেবা করার লোক ত দরকার।

হেসে ওঠে মালা কথাটা শুনে।

একটু থেমে মালা বলে—একটা জিনিস খাবে ?

—কি ?

—আমি মদ খাই না জেনেও আমার সব ফ্যান আর বন্ধুরা সমানে মদ উপহার পাঠায়। দামী দামী মদ। মেলা জমেছে। ভেবেছি এগুলো বিক্রি করে দেবো। দু বোতল শ্যাম্পেনও আছে। খাবে ? তোমার ঐ দিশি অমৃত না গিলে—

—তা মন্দ নয়।

—আর একটা কথা। আমাকে সকলে শুধু অনুরোধ করে একটা ককটেল পার্টি দেবার জন্যে। কেন বলো তো ?

—তা আন্দাজ করতে পার না।

—না, মানে—

—মানে তোমাকে একটু বেসামাল অবস্থায় পেলে ওদের

হৃদয়ের ইচ্ছা পূর্ণ হয়—এই আর কি। মনের এই গোপন ইচ্ছা তাদের।

—আমাকে কি এতই বোকা ভেবেছে ওরা ?

—পুরুষরা মেয়েদের বোকাই ভাবে।

মালা উঠে গেল। শ্যাম্পেনের বোতল দুটো বের করে আনল সযত্নে। আনল একটা গ্লাস।

প্রশান্ত বললে—তুমি খাবে না ? একটু খাও না। আর কারো সঙ্গে ত নয়। আমার সঙ্গে। একটু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি ?

—তোমার সঙ্গে খেতে পারি। যদি বেসামাল হয়ে পড়ি তুমি সামলাবে

—ঠিক আছে।

আর একটা গ্লাস এলো। মালা ভেতর থেকে রেফ্রিজারেটার খুলে দু প্লেট মাংস আর কিছু মাখন রুটিও নিয়ে এলো।

প্রশান্ত বললে—তোমার কোনও দর্শনার্থী যদি এখন আসে ?

—সোজা বলে পাঠাব যে আজ শরীর খুব খারাপ—দেখা হবে না।

—ঠিক আছে।

মালা শ্যাম্পেন ঢালল। প্রশান্ত চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল সেদিকে।

মালা বললে—নাও।

প্রশান্ত এক চুমুকে এক গ্লাস নিঃশেষ করে ফেলল আশ্চর্য দ্রুতভাবে।

মালা নিজে ঢেলে নিল সিকি গ্লাস মত। সেটুকু সে খেয়ে নিল। বললে—ইঃ, স্বাদ ত তেমন ভাল না। কি স্বাদে যে তোমরা এসব খাও!

প্রশান্ত হাসল। বললে—স্বাদ নয়—এর কাজ হলো মনের উপর। একটু পরে বুঝবে।

মাংস খেতে খেতে আবার ঢালল মালা। বললে—একটা কাজ করবে।

—কি কাজ ?

—তুমি একটা ফিল্ম স্টোরী লেখো না।

—আমার স্টোরী ফিল্ম করলে তা ফ্লপ করতে বাধ্য। তা ছাড়া কে তা করবে ?

—যে কোনও প্রযোজককে বললেই—

—তা হয় তো তোমার অনুরোধে করবে। কিন্তু তাতে ত তাদের লোকসান হবে। জেনে শুনে এভাবে তাদের তা হতে দেবো কেন ?

—ভয় নেই। আমিই প্রডিউস করব। অভিনয় ত ছেড়ে দেব ? একটা ত কিছু করতে হবে।

—তা হলে তোমাকেই বা লোকসান খেতে দেবো কেন ?

—লোকসান হবে না।

বলে মালা আবার একটু ঢালল।

—কি করে জানলে ?

—প্লটটা যে আমি ঠিক করে রেখেছি। তুমি তা শুধু লিখে দেবে।

—কি রকম ? তুমি কি আজকাল গল্পও লিখছো নাকি ?

—কি আর করবো বল ? এক কালে যখন ছিলাম সাহিত্যিকের স্ত্রী—তাই কিছু কিছু অভ্যাস ত রাখা উচিত।

—তা বটে। তা শুনি কি রকম গল্প।

—শুনবে ? মন দিয়ে শুনতে হবে কিন্তু।

—বেশ তাই শুনবো।

মালা ধীরে ধীরে শুরু করলো।

॥ তিন ॥

ধরো প্রথমে একটা কলেজের দৃশ্য। কোলকাতার একটা যে কোনও কলেজ—অবশ্য যেখানে কো-এডুকেশন। একটি মেয়ে দেশের স্কুল থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে পড়তে এসেছে সেই কলেজে। থাকে মেয়ে হোস্টেলে।

মেয়ে হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করলেও পড়াশুনায় তার মন খুব।

তার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল এক কলেজমেটের সঙ্গে। সে ঘটনাটাও তুলে ধরবে।

ছেলেটি কলেজ ম্যাগাজিনে লিখতো প্রতি সংখ্যায়। তা ছাড়া বাইরে দু চারটে পত্রিকাতেও তার লেখা ছাপা হতো। সবাই সে সব লেখা পড়ে প্রশংসা করতো। মেয়েটিও পড়তো সে সব লেখা নিয়মিত। পড়ে তারও ভাল লাগতো।

কলেজের সমাবর্তন উৎসবে মেয়েটি নিজেই যেচে আলাপ করলো ছেলেটির সঙ্গে।

ছেলেটিরও হঠাৎ ভাল লাগল মেয়েটির নম্র, ভদ্র ব্যবহার। তার দুটি স্বপ্নিল চোখ

যদিও মেয়েটি অসাধারণ মানবী নয়—তবু ছেলেটির মনে হলো সে তাই। এটা বয়সের ধর্ম। তখন তাতে সাধারণকেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অসাধারণ মনে হয়ে থাকে।

মেয়েটি প্রশংসা করলো ছেলেটির লেখার। বললে—পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত আপনার দুটো গল্প বেশ ভাল হয়েছে। বাস্তবতা-বোধ, স্যাটায়ার আর চরিত্র বিশ্লেষণ সবনিখুঁত ও হৃদয়গ্রাহী।

ছেলেটি মৃদু হাসল। বললে—যতটা প্রশংসা করছেন, ততটা প্রশংসা পাবার যোগ্য লেখা নয়।

—কেন ?

—একটু চেষ্টা করলেই ওরকম লেখা যায়। সবাই পারে।

—আমরা তো পারি না।

—চেষ্টা হয়তো করেন নি।

—তা হতে পারে।

এইভাবেই প্রথম আলাপ। তারপর দেখা হয় মাঝে মাঝে। দুজনকে প্রায়ই দেখা যায় ভিক্টোরিয়া, লেক, ময়দান প্রভৃতি নানা জায়গায়।

কখনো-বা দেখা যায় সিনেমায়।

বেশীর ভাগ সময় রাতের খাবার হোটেলে খেয়ে ছেলেট ফেরে তার আত্মীয়ের বাড়ী—মেয়েটি হোস্টেলে।

এইভাবে তিন চারটি মাস যেন তাদের বাতাসে উড়ে উড়ে কেটে যায়

ছেলেটি লেখে অনেক কম। তখন কাব্যলক্ষ্মী বা সাহিত্য লক্ষ্মীর চেয়ে মেয়েটিই তার বেশি প্রিয়। তাতে পড়াশুনার ক্ষতি হয় অনেক। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামায় না ওরা।

একদিন মেয়েটি ছেলেটিকে বলল—এভাবে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগছে না। কথাটা জানাজানি হয়ে গেছে। বান্ধবীদের কেউ বোধ হয় বাবাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে।

—সে কি।

—সত্যি কথাই বলছি। বাবাও চিঠিতে অনেক কিছু উপদেশ দিয়েছেন। তোমার সম্পর্কে সব কথা তিনি জানতে চেয়েছেন আমি সব লিখে দিয়েছি।

—কি লিখেছো ?

—লিখেছি যে, তোমাকে ছাড়া বিয়ে করব না।

—এই কথা ?

—তাছাড়া কি লিখবো ?

—কিন্তু তিনি যদি রাজী না হন ?

—কেন হবেন না ?

—কারণ তুমিও জান। তোমার বাবা গোঁড়া ব্রাহ্মণ। আর আমি কায়স্থ। এটাই তো বড় বাধা।

—তা হোক। তিনি বাধা দিলে আমি আমার পথে চলবো জেনে রেখো।

—দেখা যাবে।

এই ভাবে কথাটা হলো ঠিক। কিন্তু যখন বাবা স্পষ্ট লিখে দিলেন যে তিনি ও ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেবেন না—তখন মেয়েটি খুব আঘাত পেলো।

বাবা অবশ্য ধনী নয়—নিম্নমধ্যবিত্ত। মেয়েটিই সংসারে বড়। তার অনেক ছোট দুটি ছেলে। মেয়ের উপরে তাঁর অনেক আশা ছিল। সে কি—না বয়ে গেল ! বাবার তাই দুঃখ খুব।

যাই হোক, চিঠি লেখালেখি হলো অনেক। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হলো না।

কারণটা অতি সাধারণ। বাবা দেখলেন, যদি মেয়ে লাভ ম্যারেজ করে, তার পেছনে একটা টাকাও তিনি খরচ করবেন না। সেই টাকায় বরং অন্য দুটি ছেলেকে মানুষ করবেন।

ছেলেটির তাতে মাথা ব্যথা নেই। প্রকৃতপক্ষে তার গার্জেন কেউ নেই। বাবা-মা মৃত। দাদু তাকে পড়াশুনা চালিয়ে মানুষ হবার মতো উপযুক্ত টাকা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স করে দিয়ে গেছেন।

এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করে। তাদের মাসে গোটা পঞ্চাশ ষাট টাকা করে দেয় খরচ হিসাবে। তাই তার দায় নেই—দায়িত্বও কিছু নেই।

যা হোক, প্রথম যৌবনের একটা রাজ্যে তারা প্রবেশ করেছে।

তাই বিয়ে তাদের হতে বাধা নেই।

দুজনের বন্ধু-বান্ধবীরা মিলে বিয়ে উপলক্ষে একটা বাড়ীও ভাড়া করে ফেলল। রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে হলেও পরে নানা অনুষ্ঠানের ত্রুটি হলো না।

এলো পুরোহিতও। রীতিমতো অগ্নিসাক্ষী করে মন্ত্র পড়ে বিয়ের অনুষ্ঠান হলো সেই বাড়ীতে বেশ ঘটা করে।

শুভদৃষ্টি পাক পাক কিছুই বাদ গেল না

দুজনের সেদিন কি আনন্দ।

দুজনে যখন বেনারসী আর গরদের জোড়ের গাঁটছড়া বেঁধে সাত পাক ঘুরছিল—তখন মেয়েটির মনে খুব আনন্দ ও তৃপ্তির হাসি।

বন্ধুবান্ধবদের চেষ্টায় একটা ছোট দু'ঘরের ফ্ল্যাটও জোগাড় করা হয়েছিল।

সেখানেই দুজনে থাকতে লাগল। কোনও ঝামেলা নেই। গোলমাল নেই। শান্তির জীবন শুরু হলো। তাদের যেন পিছনের দিকে কিছু নেই। আছে শুধু সামনের দিকে—বিরাট ভবিষ্যৎ।

* * *

একটু থামলো মালা।

বললে গল্পটা কেমন জমছে বল ?

প্রশান্ত হাসলো। কোনও জবাব দিল না।

—ভাল লাগছে নিশ্চয়ই ? আরও ভাল লাগবে এর পরে। শোন।

দু'জনে কোনও দিন একসঙ্গে মিলে রান্না করে। দুজনে কোনও দিন বাইরে ঘুরে—রান্নাই হয় না। হোটেলে খেয়ে নেয়।

জিনিসপত্র কেনা হয়—নানারকম। প্রচুর।

পড়াশুনা আর হয় না।

দুজনেই ভাবে তারপর কি হবে? মেয়েটি কিছুদিন পরে অনুভব করে, সে মা হতে চলেছে। আর ছেলেটি? সে প্রচুর চেষ্টা করে একটা চাকরি যোগাড় করার জন্য।

মেয়েটি বলে—কি দরকার ওর? তুমি প্রচুর লিখতে পার তো? তাতেও তো প্রচুর রোজগার হয়।

ছেলেটি হাসে। বলে, লিখতে আমি পারি বটে—তবে প্রচুর পারি না।

—কেন?

—কারণ প্রচুর লেখা আর ভাল লেখা এক নয়। বেশী লিখলে লেখা ভাল হয় না।

—কেন?

—তা বলতে পারব না। এটা আমার ধারণা।

ছেলেটি দেখে দাদুর টাকা দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। এদিকে মেয়েটির মধ্যে মাতৃত্বের ছাপ অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তার মধ্যে ছেলেটি বললে—ডেলিভারীর জন্য মেয়েটিকে সে হাসপাতালে পাঠাতে পারবে না।

মেয়েটি বললে—বাড়ীতে করলে অনেক খরচ হবে যে!

—তা হোক।

দুশো টাকা খরচ করে একজন পাশ করা ধাত্রীকে দিয়ে বাড়াতেই ডেলিভারী হলো।

হলো একটা মেয়ে। প্রথম সন্তান। দুজনেরই একান্ত আদরের ধন

ছোট্ট একতলা বাড়ীর দুখানা ঘরের ফ্ল্যাটের একটিতে মা আর মেয়ে আশ্রয় নিলো।

এতদিনে ছেলেটি উপলব্ধি করলো, তার টাকা প্রায় নিঃশেষ।

ঘরে অপ্রয়োজনীয় জিনিস অনেক কেনা হয়েছে—কিন্তু প্রয়োজনী বহু কিছু কেনা হয়নি।

তিন জোড়া দামী চপ্পল কেনা হয়েছে মেয়েটির জন্যে। ছেলেটির জন্যে দুটি শাল। কিন্তু মেয়ের জন্য রাবার ক্লথ নেই। অবশ্য তা কেনা হলো একদিন—তবে অনেক কষ্টে।

ছেলেটি দিনরাত ভাবে।

পড়তে পড়তে কখন পড়ার মধ্যে ডুবে যায়। এত ডুবে যায় যে, দুনিয়া ভুলে যায়।

মেয়েটির এসব ভালো লাগে না। সে চায় তার স্বামী একটু প্র্যাকটিকাল লোক।

মেয়েটি একদিন বললে—একটা কাজ করলে হয় না ?

—কি কাজ ?

—আমি গল্প লিখি দু'চারটে। তোমার ত নাম হয়েছে, তোমার নামে ছাপালে টাকা পাবে। এমন কি দু একটা উপন্যাস যদি হয়।

—দেখ, পার কি-না—

সত্যি একটি গল্প মেয়েটি একদিন লিখে ফেলল অনেক কষ্ট করে।

ছেলেটি তা পড়ে হেসে খুন। বললে—চিন্তা করো, এটা একেবারে অবাস্তব হয়েছে।

যুক্তি দিয়ে সে বুঝিয়ে দিল, মেয়েটিও দেখল, সত্যি তাই। এটা অবাস্তব।

মেয়েটি ছিঁড়ে ফেলল।

ছেলেটি বলল,—চেষ্টা করো, ধীরে ধীরে হবে।—

—দরকার নেই। এ আমার দ্বারা হবে না।

এদিকে ছেলেটি চাকরীর জন্য শ দুয়েক দরখাস্ত পাঠালো নানা জায়গায়। কিন্তু কোন ফল হলো না তাতে। এইভাবে দিন কাটতে লাগল।

ছেলেটি বাড়ীতে থাকে খুব কম। মাঝে মাঝে বেশী রাতে ফেরে। চাকুরীর চেষ্টায় ঘোরে।

বাড়ীতে বুড়ো একটা চাকর। সে যা হোক একটা কাজ কর্ম্ম করে।

বিয়ের পর থেকে চাকরটা আছে। সে মাইনে না পেলেও ছাড়ে না তাদের।

এইভাবে দিন কাটে। কাটে বললে ভুল হবে—জোর করে কাটাতে হয়।

অবশেষে একদিনের কথা।

খুকুটির বয়স তখন বছরখানেক মাত্র হয়েছে।

একদিন ছেলেটি বাড়ীতে ফিরল সকাল দশটা নাগাদ। সঙ্গে একজন অপরিচিত যুবক।

ছেলেটি বললে—ইনি আমার পুরানো বন্ধু। বর্ত্তমানে বিখ্যাত ফিল্ম ডাইরেকটার, এর একটা ছবিতে একটা ছোট উপনায়িকার পার্ট খালি আছে। আমার এবং ওর ইচ্ছা, তুমি ঐ রোলটা করো।

স্ত্রী রাজী হলো না।

বললে—আমি পারবো না।

ডিরেক্টার ভদ্রলোক বললেন—প্রথম প্রথম এমনি কঠিন মনে হয় বটে—তবে চেষ্টা আর অভ্যাস থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

স্ত্রী তবু রাজী হয় না।

স্বামী বললে—চিন্তা কি ? মাত্র চার পাঁচদিনের কাজ। আমি রোজ সঙ্গে যাবো।

ডিরেক্টার বললেন—আপনি ভেবে দেখুন। এটা একটা আর্ট, একটা কলা। যদি রাজী হন তো যাবেন স্টুডিওতে। আমরা অবশ্যই ক্যামেরা টেষ্ট করে নেবো।

তিনি চলে গেলেন।

স্বামী আর স্ত্রী কথা বললো তারপর।

স্ত্রী বলে—আমি পারবো না। স্বামী বলে—তুমি নিশ্চয়ই পারবে। তোমার সে প্রতিভা আছে বলে আমার সঠিক বিশ্বাস।

বাদানুবাদ চলল। অবশেষে স্ত্রী রাজী হলো। পরদিন তারা দুজনে গেল স্টুডিওতে।

আশ্চর্য ব্যাপার। ক্যামেরা, সাউণ্ড সব টেষ্টেই মেয়েটি পাশ হয়ে গেল।

কোন বাধা রইল না। অভিনয় সে করলো ঐ পার্টে। মাত্র পাঁচ ছয়দিনের কাজ হলেও হাজার দেড়েক টাকা সে পেয়ে গেলো।

তারপর আর কোনো ঘটনা নেই।

মাস দুয়েক পরে হঠাৎ একদিন এলো দুটো কার্ড। প্রেসশো দেখবার জন্য আমন্ত্রণ। স্বামী-স্ত্রী দুইজনে গেলো ছবি দেখতে। মেয়েটির অভিনয় তার নিজের একেবারে ভালো লাগলো না। তবে স্বামী বললে—মোটামুটি হয়েছে। এরচেয়ে ভালো হওয়া শক্ত।

স্ত্রী হাসতে লাগলো।

ওসব কিছু তার কাছে খেলা বলে মনে হতে লাগলো। এই কি অভিনয় ? আর এটা কি ফিল্ম ? এই দেখবে কি লক্ষ লক্ষ লোক ?

নিশ্চিন্ত মনে স্ত্রী বাড়ী ফিরে এলো।

ফিল্মে নামা তার দ্বারা হবে না।

॥ চার ॥

মালা বললে—কেমন লাগছে গল্পটা।

প্রশান্ত বললে—মন্দ নয়। তবে বোরিং হয়ে যাচ্ছে।

—কেন ?

—তোমাদের ফিল্মের গল্পোতো চাই প্রতিটি দৃশ্যের নূতন নূতন প্রসঙ্গ।

—না, এটা ভুল ।

—কেন ?।

—আগে এটা চলতো। আজকাল বিদেশী অনুকরণ চলছে ভালো। তাই লোকে আর ঘন ঘন স্টাণ্ট পছন্দ করে না।

—তাই বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—তবে যে দেখি—নানা ফিল্মে—

সে গুলো চীফ ফিল্ম। সত্যজিৎ রায় প্রভৃতি বিখ্যাত আধুনিক ডিরেক্টারদের ফিল্মে দেখবে গল্প কিছু নেই।

—তবে কি আছে ?

—আছে জীবন—মানে লাইফ

—জীবন থেকে তাহলে আজকাল ভালো ভালো কাহিনী তৈয়ারী হয় ? মানে যাতে কাহিনী নেই—

—ঠিক তাই।

—প্রশান্ত হাসলো।

—হাসলে যে ?

—হাসবো না। বর্তমানে বাঙালীর জীবনটা কি ?

—মানে কষ্ট আছে, দুঃখ আছে, আশা আছে—সব মিলিয়ে একটা জীবনতো আছে।

—বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতি আছে।

—না তা নেই।

—বাঙালীয়ানা আছে ?

—না নেই। বাঙালীয়ানা এখন স্বাধীনতার পর হঠাৎ আধা সাহেবীয়ানা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—শোনো মালা। জীবন সৎ সাহিত্যকে অনুসরণ করে চলে। সাহিত্য জীবনে অনুসরণ করবে কেন ?

— ভালো বুঝলাম না।

—শোনো বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের সাহিত্যকে অবলম্বন করে বাঙলা দেশের তথা ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী তৈরী হয়েছে। তারা বিপ্লবীদের দেখে দেখে বই লেখেনি।

—তা ঠিক।

—বিবেকানন্দ ঋষি হলেও সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি জাতিকে আদর্শ দেখিয়ে গেছেন। জাতির অবস্থা দেখে তার নকল তিনি করেন নি।

—এটা মানলাম।

—আজকাল সাহিত্যের মানে সস্তা পত্রিকা ভড়ানো সাহিত্যের কি লেখা হচ্ছে, ফিল্মের কি কাহিনী ? তার ফলে কি হচ্ছে ? ফলে এই হচ্ছে যে তা দেখে গড়ে উঠছে আধা সাহেবী নকল নিকৃষ্ট সমাজ। অপকৃষ্ট এক সমাজ। সে সমাজের নায়করা জেমস বন্ড বা হিচককের নায়কের অনুকরণে চোঙ্গা প্যান্ট পড়ে বুক ফুলায়। সেই নরাত প্রেমের স্বপ্ন দেখে। আর এই

যদি সমাজ হয় তার অনুকরণ বা অবলম্বন করে কি ফিল্ম বা সাহিত্য হবে।

—মালা ভাবে।

—একটু পরে বলে—কথা অস্বীকার করি না।

প্রশান্ত বলে—তাইতো দেখতে পাচ্ছো আজ সারা দেশের সেক্স পত্রিকা ছড়াছড়ি। পুলিশ মাঝে মাঝে ধরে, আবার বের হয় নতুন নামে। এই ব্যবসা, এর চেয়ে কোল্ড স্টোরেজে আলু রাখলে বেশী টাকা পেতো। এভাবে জীবন ও সংস্কৃতি নিয়ে ছেলে খেলা করা ব্যবসা করেছে যে সব পত্রিকা তাদের কি শাস্তি দেওয়া উচিত বলো।

—তা বটে।

—তাই জীবনকে প্রতিফলন করো সাহিত্য এটি আমি মানি না, বরং বলতে পারো, জীবনের যা ভুলভ্রান্তি তার সমলোচনা করো। তাকে চাবুক মারো। বার্নার্ডশ দ্রষ্টয়ভস্কি বা লুট্‌হাসসুন হতে হবে। সমাজে যা চলছে তা রসিয়ে রসিয়ে লিখে নাম কেনা যাবে, টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু তাতে তো বিকৃত সমাজ আরো বিকৃত হবে। সমাজে অন্যায় যারা করতো তারাতো বাজার ভেবে করতো। সাহিত্যের সম্বর্ধনা পেলেতো তারা সেটাকে ন্যায় ভাববে।

—তা বটে।

—তাই দোহাই তোমার—তুমি যা গল্প বলছো, তাই বলো—এর মধ্যে অহেতুক ভূমিকা জুড়ো না।

—ঠিক আছে।

একটু থামো মালা।

তারপর বলে—গল্পটা কতদূর বলা হলো?

—ঐ যে, স্ত্রী সিনেমা দেখে ফিরে এলো।

—হ্যাঁ, তারপর আর কি? সামান্য বাকী।

—তার মানে ? সবেতো শুরু !—

—শুরু নয়—তারপর স্ত্রীর ধারণা ভুল প্রমাণ হয়ে গেলো। অনেক প্রযোজক এলো। কন্ট্রাক শুরু হলো। প্রথমে ছুটো। তারপর আরো চললো।

—স্বামী কলকাতায় জমি কিনে স্ত্রীকে বাড়ী বানিয়ে দিল। একতলা বাড়ী। মেয়েকে পাঠালো বোর্ডিংয়ে। তারপর নিজে একদিন কেটে পড়লো। সে স্ত্রীকে বললে—তোমার পথ বেশ সচ্ছল। তুমি চলো। আমি এবার চলি। আমার আদর্শটো রাখতে হবে। তাই স্বামী একতলা এক ঘরের কামরা ভাড়া নিয়ে বসে বসে রাতের পর রাত উপন্যাস লেখে—তার আদর্শ উপন্যাস—মাঝে মাঝে লেখে গল্প। তাছাড়া কিছু টিউশনি করে। কিছু টাকা পায়। মাঝে মাঝে বাঙলা তরল পদার্থ খায়। এই নাকি তার আদর্শ—স্ত্রীর মনে ব্যথা দেওয়া।

—একটু থামে মালা।

—একটু করে শ্যাম্পেন ঢালে ছুইটি গ্লাসে।

—তারপর বলে—স্ত্রী দাবী করতে পারতো। কিন্তু স্বামী সে সুযোগ দেয় না। ঠিকানা দেয় না। নিজে দেখা করে ছুচার মাস পরে ছুই একদিন। তিনটি বৎসর স্ত্রী এদিকে কিভাবে কাটালো সে খবর সে রাখে না।

স্বামী মনে করেছিল—স্ত্রী বোধহয় এবার বিয়ে করে নতুন ঘর পাতবে।

কিন্তু স্ত্রী একরোখা। তারও আদর্শ আছে। চেহারা দেখিয়ে টাকা উপার্জ্জন করতে পারে, কিন্তু সে নীচে নামতে রাজী নয়।

তখন প্রশ্ন হলো—কার আদর্শ বড়, স্বামীর না স্ত্রীর ?

প্রশান্ত বললে—তারপর—

মালা হাসলো। বললে—তারপর শেষ করার ভার তোমার।

—তুমি যখন গল্পটা তৈরী করেছো—তাছাড়া তুমি হবে প্রোডিউ-সার, তখন তা শুনতে হবেতো।

—তাহলে আর তোমাকে ভার দেবো কেন? তবে একটা কথা।

—কি কথা বলো।

—আগেকার দিনে প্রমথেশ বড়ুয়া আমলে ট্রাজেডির দাম ছিলো মাঝখানে জোর চলল কমেডি। আজকাল আবার ট্রাজেডিই ভালো চলছে।

—তাই নাকি?

—মিথ্যা বলে আমার লাভ?

—তা বটে।

—আজকাল ট্রাজেডি চলছে বটে। তবে আমি জোর করে তোমাকে তা করতে বলছি না। তুমি যা হোক একটা করো।

—ডায়ালক সব আমার ইচ্ছা মত দেবতো।

—নিশ্চয়ই। তবে এ কথা কেন?

—কারণ তুমি দেখলাম, স্ত্রীটির পক্ষ নিয়ে বেশী কথা বললে। এটা এক তরফ হয়ে গেল। আমি দুইজনের পক্ষ নিয়ে কথা বলবো। তবে আমাকে সব চরিত্রের প্রতি উপযুক্ত মন দিতে হবে তো। তবে সাইডের চরিত্র কিছু বলোনি।

—সে-গুলো তুমি বসিয়ে নেবে।

—তা না হয় নেবো। তা দক্ষিণা কত পাওয়া যাবে, তা বলো।

—সেটা গল্প শুনে। মানে জিষ্ট শুনে। কবে তুমি জিষ্ট দেবে।

—যদি বলি পরশু।

—পারবে?

—নিশ্চয়। তোমার আমার জীবন নিয়ে যে গল্প সে তো সব বাস্তব ঘটনা। এটা লিখতে আর এমন কি সময় লাগবে।

মালার দুচোখে হঠাৎ দেখা গেল জল।

—তুমি কাঁদছো?

—না, কান্নার অভিনয় করছি।

—তার মানে?

—মানে তোমার এবং অনেকের ধারণা যেহেতু আমরা অভিনেত্রী তাই সবই আমাদের বোধ হয় অভিনয়।

—তা সত্য নয়।

—তা সত্য হতে পারে না; অভিনয় করি আমি স্টুডিয়োতে বাড়িতে বসে নয়।

—প্রশান্ত একটু থামলো।

বললে—তুমি কখনো ওসব যাওনি, তাই বোধ হয় আজ বেসামাল হয়ে পড়েছো। তা হোক। আমি এখন উঠবো।

—বসোনা; একটু বসলে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

—তা জানি। তবু বসতে পারবো না আমি বেশীক্ষণ।

—কেন?

—আমি একটা কাজে এসেছি তোমার কাছে।

—কি কাজ?

—মাসের শেষ তো। কয়েকটা টাকা ধার নেবার ইচ্ছা ছিল আমার।

—এই কথা, সে তো তুমি যখন ইচ্ছা বললেই পেতে। কত?

—গোটা কুড়ি।

—ছি! তোমার লজ্জা করে না? মাত্র কুড়ি টাকা তুমি চাইতে

পারলে ? অথচ তুমি জান, কুড়ি হাজার চাইলে আমি কত খুশী হতাম।

—তা জানি। তবে তা নেবার অধিকার আমার নেই। এটা তোমার উপার্জন।

—তুমি হাসালে। কুড়ি টাকা আমার ব্যাগে নেই। খুলে দেখ—সব একশো টাকার নোট। দুটো খুচরো টাকা ছিল—তা দিয়ে তো সিগারেট আনালাম।

—খুচরো নেই ?

—না।

—নেই কেন ?

—কেন না আমি নিজের গাড়িতে চেপে সোজা স্টুডিও থেকে আসছি। আর কোনও কোম্পানী খুচরো টাকা দেয় না। সব দেয় একশো টাকার নোট।

—তা বটে।

—তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাকে একশো টাকা নিতে হবে।

—বেশতো তাই দাও।

একশো টাকার একটা নোট নিয়ে পকেটে রাখল প্রশান্ত। বললে—ঠিক আছে, পঁচিশ টাকা দেবে বাড়িওয়ালাকে, ঘরভাড়া। পঁচিশ টাকা দেবো তবে সাধনকে। ও মাইনে নেয় না। কিছু দেওয়া উচিত তাকে।

—হরিসাধন এখনো আছে ?

—আছে। বুড়ো আমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না। যদিও আমি বাড়ি ভাড়া করে উঠে আসার পর তাকে বলি চলে যেতে। সে যায়নি। মাইনে কখনো সখনো পায়। দুবেলা দুমুঠো খেতে তো পায়। এই তার ঢের। তবে আমাকে কেন জানিনা বড্ড অবজ্ঞা করে।

—করবে না ?

—কেন করবে ?

—তুমি যে অবজ্ঞার মত কাজ করেছো। নিজের বৌ-মেয়েকে যে প্রতিপালন করতে পারেনি—তার পরে আবার বৌ কিছু করতে পারল বলে তাকে যে ত্যাগ করল, তাকে সে কি পূজা করবে ?

—মালা !

—কি ?

—তুমি ওভাবে বলছো কেন ?

—বলবো না ?

—কেন বলবে ?

—কেন বলবো ? বিয়ের সময় নিশ্চয়ই আমাদের এমন অঙ্গীকার ছিল না যে, তুমি উপার্জন করলে আমাকে আজীবন সুখে রাখবে আর আমি করলে তোমাকে কিছু দেবো না—আমাকে পৃথকভাবে দিন কাটাতে হবে বিরহিনী যক্ষপ্রিয়ার মত—

—না না, তা নয়—

—তবে কি ? কি তোমার আদর্শ ? আমি অভিনয় তো করতে চাইনি। তুমিই তো—

—তাতে কি ? তুমি তো শান্তিতে আছো—

—এর নাম শান্তি ?

—তবে কি ?

—এর চেয়ে চরম অশান্তি মেয়েদের আর কিছু হতে পারে না।

—কিন্তু আমি যে অবস্থায় থেকে, যে মন নিয়ে আমার আদর্শ উপন্যাস লিখছিলাম, তার সুর কেটে যেতো, যদি আমি তোমার সঙ্গে ওখানে থাকতাম। তা তো তুমি মানবে ?

—না মানবো না।

—কেন ?

—মনের অবস্থাকে শিল্পীরা যে কোনও সময় যে কোনও কল্পনা-লোকে নিয়ে যেতে পারে। তা না হলে সে শিল্পী হলো কি করে ? যদি গ্রীষ্মের দুপুরে বসে শীতের ইংলণ্ডের ছবি আঁকতে না পারল, তবে সে শিল্পীর কিসের ইমাজিনেসন্ ।

প্রশান্ত হাসল।

—হাসছো যে ?

—এবার আমি হার মানলাম মালা।

—কেন ?

—কারণ তোমার অভিনয় দেখে আমি বুঝেছি তুমি তা পারো। তুমি সত্যি শিল্পী।

—যাক, আর লেকচার দিতে হবে না।

বলে মালা শেষটুকু ঢেলে দিল গ্লাসে।

বললে—দুটি বোতল শেষ হলো। আর নেই কিন্তু।

—তা জানি।

—বেশ, এবার অন্য কিছু চলবে। মানে যে যা পাঠায়, সবই তো থাকে জমা। তবে আমি আজ প্রথম। আমার আর চলবে না।

—আমারও আর লাগবে না।

বলে প্রশান্ত গ্লাসটা তুলে নিল হাতে।

॥ পাঁচ ॥

গ্লাসের তরল পদার্থটুকু শেষ করে প্রশান্ত বললে, এবার তাহলে আমি উঠবো।

—উঠবে? তার মানে?

—কেন?

—কটা বাজে জান?

—না।

—এই দেখ সাড়ে আটটা।

—তাহলে তো উঠতেই হবে। আমাকে যে যেতে হবে অনেকটা পথ, তা ত জান।

—না, যাবে না।

—যাব না?

—না—না—না!

—মালা উত্তেজিত।

প্রশান্ত তার মাথায় হাত রাখল। বললে—একি তোমার মাথা যে গরম।

—গরম হবে না?

—না।

—এক বোতল শ্যাম্পেন তুমি আজ জীবনে প্রথম আমাকে খাওয়ালে কেন?

—আমি তো খেতে বলিনি?

—তবে?

—তুমিই তো বের করেছো।

—বেশ করেছি। তুমি আজ যাবে না।

—তোমার ঝি চাকররা কি ভাববে।

—কি ভাববে? সবাই জানে তুমি আমার স্বামী।

—একদিন ছিলাম।

—আজ নেই? তার মানে?

—মানে আজ তোমার জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চাই না।

—এই কথা?

—তুমি ভীরু, কাপুরুষ, স্বার্থপর—

—তুমি রাগ করছো—

—রাগ নয়। এটাই আমার মনের কথা। এতদিন মন খুলে কথা বলতে পারিনি। তোমাকে কখনো বাধা দেইনি আমি। এমন কি তুমি আমার হৃদয়ে চাবুক মেরে গেলেও কথা বলিনি।

—আজ বলবে?

—বলবো। আজ সব বলবো। কারণ আজ আমি মদ খেয়েছি। আমার মনের কথা কিছুই চাপা থাকবে না।

—একি বলছো তুমি?

—ঠিক বলছি। আমাকে বাধা দিতে তুমি আজ পারবে না।

মালার মাথা, কপাল, হাত, গায়ে মৃদু মৃদু স্পর্শ করলো প্রশান্ত বললে—তুমি একটু শান্ত হও মালা।

—না, তা হবো না। আজ আমি দাবি জানাবো।

—কিসের দাবি?

—নারীত্বের।

—তার মানে?

—মানে তুমি আমাকে বঞ্চনা করেছো। একটা কন্যা তুমি

আমাকে দিয়েছো—কিন্তু একটি পুত্র চাই আমি। মেয়েতো চলে যাবে পরের ঘরে। আমার শেষ জীবন তবে কাটবে কি নিয়ে?

—এটাও তোমার মিথ্যে রাগ। আমি তো তোমাকে স্বাধীনতা দিয়েছি।

—না। স্বাধীনতা দাও নি? তুমি কি চাও আমি ব্যাভিচারিণী হই।

—না।

—তবে?

—ঠিক আছে তোমার কথা আমি রাখব। তার আগে সময় চাই। আমাকে ভাবতে দাও। আমি দায়িত্ব নিতে পারব না—আর আমি কেন পিতা হতে যাবো?

—দায়িত্ব নাও। তোমাকে নিতে হবে। আমিতো বারণ করিনি। জেনে রেখো, এ সব তোমার।

প্রশান্ত আবার মালাকে আদর করে তাকে শান্ত করে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

মালা কাঁদে। চোখের জল বাধ মানে না।

—তুমি কাঁদছো?

—হ্যা, এটা যাই হোক, আমার মিথ্যা অভিনয় নয়।

—তা জানি।

—তবে বল, আজ তুমি থাকবে?

—না, আজ নয়। তোমার মনকে তুমি স্থির করো।

—তুমি গল্প লিখবে তো?

—ফিল্মের গল্প?

—হ্যাঁ।

—পরশু আসবে?

—আসবো।

—কটায় ?

—বেলা দশটাতে।

—না, বেলা এগারোটাতে তুমি যাবে সোজা সাদার্ন স্টুডিয়োতে।

—তুমি থাকবে ?

—থাকবো।

—বেশ, তাই হবে। আজ তুমি শান্ত হও। আজ ভাবো। ঘুমায়। পরশু তোমার সঙ্গে ঠিক আমি দেখা করব।

—এটা তোমার সত্যি কথা—না এটাও কোনও নতুন অভিনয়

—তোমাকে ছুঁয়ে বললাম।

—ঠিক আছে। দাঁড়াও।

প্রশান্ত দাঁড়াল।

মালা তাকে প্রণাম করল। বললে—আজও মেনে নিলাম তোমার কথা। কিন্তু পরশু আমি তোমাকে চাই। গল্প নিয়ে আসবে।

—কি হবে এ গল্প।

—দেখতেই পাবে।

—আচ্ছা। তা হলে আমি চলি।

—এসো—

প্রশান্ত উঠে দাঁড়ায়। চলতে থাকে। আর মালা বিছানায় লুটিয়ে পড়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেয়।

প্রশান্ত নিচে নামে।

বাইরে আসে। পকেটে হাত দেয়। আট আনা পয়সা আছে। একশো টাকার নোটটা বুক পকেটে।

বেরিয়ে এসে একটা রিক্শা নেয়।

—কোথায় যাবেন বাবু ?

রিকশাওয়ালা তাকায় ভালো করে।

—সোজা দক্ষিণ দিকে। নেতাজী মহল্লা। কত ভাড়া নেবে।

—দশ আনা।

—না, আট আনা দেব।

—আচ্ছা আসুন।

প্রশান্ত উঠে বসে রিকশাতে।

রিকশা ছুটে চলে।

* * *

বাড়ী ফিরে আসে প্রশান্ত।

রিকশার ভাড়া দিয়ে বিদায় দেয়।

রিকশাওয়ালা চলে যায়। ছোট একতলা বাড়ী। তারই বাইরে একটা ঘর।

কড়া নাড়ে।

হরিসাধন দরজা খুলে দেয়। বুড়ো চাকর।

—বাবু, এত রাত হলো—

—হ্যাঁ রে।

প্রশান্ত একশো টাকার নোটটা তার হাতে দিয়ে দেয়। বলে—দু প্যাকেট সিগারেট আনতে আর দুদিস্তে কাগজ।

—তাতে তো ভাঙানী দেবে না।

—ঠিক আছে।—তবে কাল সকালে ভাঙিয়ে দিয়ে দিস। ধারে আনবি।

হরিসাধন তাকায়। বলে—এত টাকা—

—ও কিছু না। অনেক পাব আরও—আমি যে নতুন কনট্রাক্ট পেলাম গল্প লেখার।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, শোন্, পঁচিশ টাকা ঘর ভাড়া দিবি। পঁচিশ টাকা তুই নিবি। আর পঞ্চাশ টাকা থাকবে। তাতে যা হয় তাই হবে।

—ঠিক আছে।

—খাবার আছে ?

—হ্যাঁ বাবু। ও বেলা তো এলেন না। ভাত, মাছ, আর ডাল আছে ?

—তুজনের হবে ?

—অনেক ?

—ঠিক আছে, যা।

হরিসাধন চলে যায়। একটু পরে ফিরে আসে সে ধীর পায়ে।

তার হাতে তু প্যাকেট সিগারেট, একটা ম্যাচ আর তু দিস্তা কাগজ।

প্রশান্ত বলে—খেতে দে।

সামান্য খেয়ে নিয়ে সে লিখতে বসে। হরিসাধন চলে যায় খেয়ে দেয়ে।

প্রশান্ত লিখতে থাকে।

ফিল্মের জন্য গল্প সে এর আগে লেখেনি। তবে এটা লেখে মন দিয়ে।

মাঝে মাঝে লেখে—আবার কিছু কিছু কেটে বাদ দিয়ে দেয়।

লেখা চলতেই থাকে দ্রুত গতিতে।

মাঝে মাঝে সিগারেট ধরায়। আবার লেখে। কটা বাজে তা হুঁশ থাকে না।

রাত বাড়ে।

*　　*　　*

ঢং ঢং—

দূরের পেটা ঘড়ি জানিয়ে দিল রাত দু'টো বেজে গেল।

প্রশান্ত উঠে বসে।

না, আজ আর নয়।

খাতার দিকে তাকায়। কয় ঘণ্টা ধরে সে একমনে শুধু লিখছে মোট চল্লিশ পাতা লেখা হয়ে গেছে।

গল্পটা অবশ্য মালা যা বলেছিল ঠিক তাই নেই। মাঝে মাঝে বাইরের অনেক চরিত্র এসে গেছে তার মধ্যে।

প্রশান্ত হাসে

মাত্র একদিনেই চল্লিশ পাতা।

মালা দেখে খুশী হবে। কালই শেষ হবে এটা।

খাতাপত্র গুছিয়ে রেখে মাথায় একটু জল ঢেলে দিয়ে সে শুয়ে পড়ে।

রাত অনেক হলো।

আজ আর নয়। কাল বাকিটুকু শেষ করতেই হবে তাকে।

॥ ছয় ॥

সাদার্ন স্টুডিয়ো।

প্রশান্ত আজকাল স্টুডিয়োতে আসে না। বহুদিন আগে এসেছিল সে। তা প্রায় হলো কয়েক বছর আগে। মালাকে সঙ্গে নিয়ে।

তারপর আজ এলো।

হাতে তার গল্পের খাতাটা ধরা।

একজন দ্বারোয়ান তাকে ধরলো।—কাকে চান?

—ম্যানেজার বাবুকে।

—কার্ড আছে?

—না।

—একটা কাগজে নাম ঠিকানা লিখে দিন।

—ঠিক আছে।

প্রশান্ত একটা কাগজে নাম ঠিকানা লিখে দিল।

দ্বারোয়ান সেটা নিয়ে চলে গেল ভেতরে।

একটু পরে এলো।

বললে—ভেতরে চলুন। বাবুরা আপনার জন্যে বসে আছেন।

—বাবুরা মানে?

—মানে ডিরেক্টর রায় বাবু, প্রডিউসার শ্যামল বাবু, আর মালা দিদিমণি—

—কোথায়?

—অফিস রুমে।

—ঠিক আছে—চল।

ভেতরে যায় প্রশান্ত। সে ঢুকতেই তারা এমনভাবে অভ্যর্থনা জানায়, যা অপ্রত্যাশিত।

—আসুন স্যার—আসুন—

মালা হাসে!

প্রশান্ত তাকায় অন্যদিকে।

রায় বাবু বলে—শুনলাম আপনি একটি অদ্ভুত রিয়ালিষ্টিক চমৎকার কাহিনী লিখেছেন।

—হ্যাঁ—লিখেছি। তবে তা চমৎকার কি-না তা জানি না আমি।

—মালা দেবী সার্টিফাই করলেন। উনি আবার খ্যাত উপন্যাসিক যা তা কাহিনী পছন্দ হয় না।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, আপনার তো নাম আছে বাজারে—ভাল ছোটগল্প লেখেন।

—তা আছে। তবে এটি কেমন হবে—

—বেশ তো, শোনান না—

—হ্যাঁ।

প্রশান্ত বলল।

রায় বাবু বললেন—ট্যাজেডি না কমেডি?

—সেটা শেষ করিনি। দুভাবে লিখেছি। যেটা মনঃপুত হয় আপনাদের—

—দুভাবে?

—হ্যাঁ।

—এটা মন্দ নয়। যে কোনওভাবে শেষ করা যাবে সময় অনুযায়ী।

—তা বটে।

প্রশান্ত গল্প শোনাতে থাকে।

প্রতিটি দৃশ্য শোনার পর ওঁরা খুশী খুশী ভাবে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন।

দুরকম শেষ অধ্যায় শোনায় প্রশান্ত।

মিঃ রায় বলেন—ট্রাজেডিই ভালো।

প্রডিউসার বলেন—না না, কমেডিটাই ভাল।

—তা হোক, সেটা পরে স্থির করব আমরা।

—ঠিক আছে, তাই হবে। বলে প্রশান্ত।

প্রডিউসার বলেন—দক্ষিণা কত দিতে হবে এবার বলুন তো?

—আপনারা কত দিতে চান?

—দশের বেশী পারব না।

প্রশান্ত ভাবে দশটার মানে কি? দশ শত না দশ হাজার?

তার ভাবনা ছিন্ন করে মিঃ রায় বলেন—জানেন তো, বাংলা ছবি দশ হাজারের বেশী দেওয়া তাই সম্ভব হয় না।

—ঠিক আছে।

তক্ষুণি একটা কাগজে সই করে দশ হাজার টাকার চেকটা নেয় প্রশান্ত।

তারপর বলে—তাহলে চলি। এটা ভালো চললে আবার দেখা করব।

—ভালো চললে মানে? দুর্দান্ত হিট্ ছবি হবে। তবে একটা কথা—

—কি বলুন?

—মাঝে মাঝে একটু পাল্টাবার যদি দরকার হয়? তাহলে—

প্রশান্ত হাসে।

—হাসছেন যে ?

—হাসছি এইজন্য যে, সাহিত্যে পাল্টানো আমি পছন্দ করি না ; তবে সিনেমাতে তা তো করতেই হবে ।

—আপনি মানেন একথা ?

—নিশ্চয়ই ।

—কিন্তু অনেক সাহিত্যিক আবার গোঁ ধরে পালটানো চলবে না ।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ ।

—সাহিত্যের দাম সাহিত্যিক বুঝতে পারেন ; তবে সিনেমার টেকনিক তাদের থেকে আপনারা কম বোঝেন না ।

মিঃ রায় বলেন—নিশ্চয় ।

যা হোক প্রশান্ত ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে বাইরে ।

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে সে ট্যাক্সি খুঁজতে থাকে । কিছু পায় না ।

হঠাৎ দেখে মালা বেরিয়ে এসেছে তার গাড়ি নিয়ে, ড্রাইভার চালাচ্ছে ।

মালা বলে—ওঠে এসো ।

—আমি ?

—হ্যাঁ ।

—কিন্তু—

—কোন কিন্তু নয় । আমার পাওনাটা এখনো পাইনি ।

—তোমার পাওনা ?

—নিশ্চয় । ও গল্পের অর্ধেকটি তো আমার দেওয়া, আমার জীবন ওতে অর্ধেক জড়িত । তাই তার মূল্য—

প্রশান্ত হাসে ।

বলে—নিশ্চয় পাবে।

—তবে চলো—

প্রশান্ত গাড়িতে ওঠে।

গাড়ী ছুটে চলে মালার বাড়ীর দিকে।

*　　　*　　　*

গাড়ী থেকে নেমে দুজনে উপরে যায়।

মালা পোশাক পাল্টে আসে। প্রশান্তকে বলে—যাও, বাথরুম থেকে স্নান করে এসো। নতুন জুতো পাঞ্জাবী আছে। পরে এসো।

—হঠাৎ—

—নিশ্চয় ? তুমি কথা রেখেছো—তাই আমি খুসী হয়ে তোমাকে এটা দিলাম।

—কথা রেখেছি ?

—নিশ্চয়ই।

—কিন্তু আমার আদর্শ উপন্যাসের তুলনায় এ কাহিনীতে কিবা তেমন আছে। তুমি ভাবছ—

—কিছুই ভাবছি না।

—তার মানে।

—মানে গল্প খারাপ হলে মিঃ রায় তা কখনও নিতেন না।

—তা বটে। তাহলে কাহিনী ভাল ?

—নিশ্চয়।

—চলবে।

—ভয়ঙ্কর চলবে। তুমিই বিচার করবে এরপরে, ওটা ভাল হবে কি-না ?

—কিন্তু ওর বারো আনাতো আমাদের জীবন-নিয়ে লেখা।

—তাই তো ভালো হবে।

—জীবন নিয়ে লিখলে তা ভালো হবে বলে কেন তোমরা মনে করো ?

—আমরা নয়, সকলে করে।

—তা তো জানি।

—আর তাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

—কিন্তু মাঝে মাঝে ত আমি বাস্তব জীবনের অনেক কিছুকে ঠাট্টা উপহাস করেছি।

—তা তো করবে তা জানতাম।

—কেন ?

—কারণ তুমি জীবনে সফল হতে গিয়ে পারনি তাই এটা স্বাভাবিক।

—তুমি জানতে আমি এরকম করে লিখবো ?

—জানতাম। তাইতো বুঝেছিলাম যে গল্পটি তোমার হাতেই জমবে।

—জমেছে ?

—নিশ্চয় !

—কিন্তু—একটু জোলো হবে না ত—

—না !

—কোনটি ভাল হবে ? ট্র্যাজেডি না কমেডি ?

—তা এখন বলবো না।

—তুমি ঠিক করে রেখেছো ?

—রেখেছি।

—তবু বলবে না।

—না।

একটু হাসে মালা, তারপর বলে—এবার আমার পাওনাটা—

—সবটাই তুমি নাও।

বলে টাকা বের করে দেয় প্রশান্ত।

—আর তুমি ?

—আমাকে যা দেবে।

মালা হাসে। বলে—আমার পাওনা টাকার পাওনা নয় আমার দাবী—

—ঠিক আছে। চিন্তা করি—

—এখনো করনি ?

—না।

—কেন ?

—এ দুদিন ত গল্প ভাবতে ভাবতেই কেটে গেল, অন্য ভাবনা কখন ভাববো ?

—ভাববে। আজই।

—না, তা হয় না।

—কেন ?

—কারণ কিছু নেই। আমার ইচ্ছা—

—বেশ। তবে একটা কথা।—

—কি কথা ?

—তুমি রোজ আসবে এখানে।

—কেন ?

—তোমার পরবর্তী সব গল্প ত লিখে রাখতে হবে এখন।

—এখনই।

—হ্যাঁ, কারণ মিঃ রায় তিনমাসে স্যুটিং শেষ করেন। তারপর শেষ হলেই ত সব প্রযোজক ছুটে আসবে।

—ছুটে আসবে কেন ?

—তোমার গল্পের জন্য।

—কিন্তু এই সামান্য গল্প—

—এটা সামান্য নয়। এটা ভাল ছবি হবেই। তবে এর পরে টাকার জন্য যা লিখবে, তা সামান্য হতে পারে অবশ্য।

—টাকার জন্য লেখে ত সস্তা সাহিত্যিকরা।

মালা হাসে।

—হাসছো কেন?

—কোন সাহিত্যিকই চান না সস্তা কাহিনী লিখতে। তা জানো।

—জানি।

—কিন্তু চেষ্টা করলেও জোর করে ভালো লেখা বের হয় না কখনো। তাই সস্তা হয়ে যায়। তবে তোমার কাহিনী তো সস্তা হয়নি। কারণ জোর করে তুমি এটি লেখোনি। এটা তোমার বাস্তব চিন্তার প্রতিফলন।

—তুমি ঠিক জানো।

—নিশ্চয়, আমার তাই ধারণা। তাই বলছি, এর পরে চেষ্টা করে ভাল লিখতে গেলেও তা ভাল হবে না। তখন কি তোমার ঐ আদর্শ উপন্যাসটিও আদর্শ নাও হতে পারে।

—কি বলছো তুমি?

—ঠিকই বলছি। দেখ, এককালে সাহিত্য বুঝতাম না। তবে এখন পড়ে পড়ে অনেক শিখেছি। ভাল লেখা জোর করে হয় না। হঠাৎ একদিন তা আপনি এসে যায়। যেমন হঠাৎ একদিন ইচ্ছা না করলেও কোন বৈজ্ঞানিক নতুন আবিষ্কার করে ফেলেন।

—তা কি সত্যি?

—নিশ্চয়, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প সব বিষয়ে এক কথা।

র‍্যাফেল জানতেন না যে তার আঁকা চিত্রই শ্রেষ্ঠ চিত্র হবে। তবে পরে তিনি চেষ্টা করেও তার চেয়ে ভাল আঁকতে পারেন নি। দ্য ভিঞ্চি জানতেন না যে 'মোনালিসাই' হবে তার শ্রেষ্ঠ চিত্র। ন্যুট হামসুন জানতেন না যে, তাঁর 'গ্রোথ অব দি সয়েল'ই হবে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাই বলছিলাম যে, তুমি ইচ্ছা করলেই তোমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে সৃজন করতে পার না, বুঝলে ?

— তবে তো হতে হয় নিয়তিবাদী।

—নিশ্চয়ই।

—তবে আর শিল্পীর মর্যাদা কি রইলো ?

তা থাকলো নিশ্চয়ই। কারণ ঐ শিল্পীর হাত দিয়ে তা সৃষ্টি হলো—অন্যের হাত দিয়ে তা হতো না। একজন সাহিত্যিক বা শিল্পী অনেক লিখে যান। তবে তার মধ্যে তার কোনটা যে শ্রেষ্ঠ হবে তা সে নিজে কখনো বলতে পারে না। তার কাজ চেষ্টা করা কিন্তু সার্থকতা অন্য জিনিস।

প্রশান্ত চুপ করে।

একটু থেমে বলে—তা তো হলো কিন্তু এখন আমি কি করবো এই টাকাগুলি নিয়ে ?

—যা সবাই করে। তুমি এরপর তোমার সমস্ত প্রয়াস দিয়ে লিখে যাবে। মনে রেখো তুমি আর একটাকেই জোর করে শ্রেষ্ঠ বানাতে পার না। কারণ শ্রেষ্ঠ লেখনী হয়তো বের হয়ে আসবে পূর্ণ অজ্ঞাতসারে।

—তা হতে পারে।

চিন্তা করে প্রশান্ত বলে।

—যাক, কথা অনেক হলো। বলো কি খাবে ? মাংস আর মাছ দুটোই আছে। ভাত না রুটি ?

—রুটি।

—ঠিক আছে। কিন্তু শ্যাম্পেন আর নেই।

—আজ তা চাইও না।

—কেন?

—কারণ একদিন যা শিক্ষা দিয়েছো।

প্রশান্ত হাসে।

মালা বলে—আমিও তা জানতাম। তাই পর দিনই ঘরে যতো উপহার পাওয়া মদ ছিল সব বিক্রি করে দিয়েছি।

—সত্যি?

—হ্যাঁ, তা না হলে, এগুলি আমার মাথা না খেলেও তোমার ক্ষতি তো করতে পারে

—তা বটে। ভালই করেছো।

মালা উঠে দাঁড়ায়।

—কোথায় চললে?

—পাশের ঘরে?

—হঠাৎ?

—বা, খাবার আনতে বলবো না?

—তা বটে।

একটু পরে খাবার আসে। মালা আর প্রশান্ত খেতে বসে।

খাওয়া শেষ হতে হতে বিকেল হয়ে যায়।

দুটা বাজে।

মালা বলে—একটা কথা—

—কি?

বহুদিন তোমার সঙ্গে বেড়ান হয় না। চল আজ একটু বেরিয়ে আসি।

—কোথায় ?

—তুমি কোথায় যেতে চাও ?

—যেখানে বলবে ।

—না, তা নয় ।

—তবে ?

—চল একটু দক্ষিণেশ্বর যাবো ।

—হঠাৎ ভক্তি ?

—ভক্তি নয় । মায়ের কাছে আমার একটু কৃতজ্ঞতা নিবেদন ।

—তার মানে ?

—মানে । তুমি সত্যি আজ আসবে কিনা তা জানতাম না । তাই মার কাছে মানত করেছিলাম ।

—কি মানত ? বলে প্রশান্ত হাসল ।

—আজ তুমি গল্প লিখে নিয়ে এলে মার কাছে ভোগ দেব ।

—বাঃ, এত মাকে ঘুষ দেওয়া—

—না, তা নয় । এটা হলো আমার মনের ভক্তি নিবেদন ।

—বাঃ, বেশ বলেছো তো !

—হ্যাঁ, এখন ওঠো ।

দুজনে নীচে নেমে আসে । মালা গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বলে—সোজা চলো দক্ষিণেশ্বর ।

—আচ্ছা মাইজী ।

ড্রাইভার গাড়ি চালায় ।

॥ সাত ॥

দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে মায়ের মন্দিরে ঢু:কে পূজো দিল মালা। শুধু পূজো নয়—জবা ফুলের বড় বড় কটি মালা, পদ্মফুল দিয়ে বেশ ভালো করে পূজো দিল সে।

প্রসাদ সামান্য নিজের মুখে দিয়ে কিছুটা দিল সে প্রশান্তর মুখে। তারপর বাকি সবটুকু দিয়ে দিল সে ড্রাইভারের হাতে।

গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়াল দু'জনে।

সামনে গঙ্গা বেয়ে যাচ্ছে।

সবে সন্ধ্যে নেমেছে।

সুন্দর হাওয়া আসছে।

গঙ্গার বুক থেকে এদিকে বয়ে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া।

ওপাশের বাড়ীঘর, কলকারখানা অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে এ-পার থেকে।

প্রশান্ত বললে—সুন্দর লাগছে আজ ওপারের দৃশ্যগুলো। তাই না?

মালা বললে—আমার আরো সুন্দর লাগছে কি জানো? সুদীর্ঘ পাঁচ বছর পরে দুজনে আজ একসঙ্গে এসেছি আবার দক্ষিণেশ্বরে।

– পাঁচ বছর।

—হ্যাঁ গো। তোমার মনে নেই সেই বিয়ের তারিখে এখানে এসেছিলাম; তাতো পাঁচটি বছর হয়ে গেল। তারপর তো তুমি একদিন কোথায় ঘর ঠিক করে ডুব দিলে?

—হু।

—তা তোমার ভালো লাগছে না।

—লাগছে।

—কি?

—ওপারের দৃশ্য। বলে প্রশান্ত হাসল।

—ও ওপার ভাল লাগছে। এপার নয়?

—মানুষের নিয়মই এই। জান না একটা কবিতা আছে সেই যে—

"নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস
ও পারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।

মালা বলে—তোমাদের নিয়মই এই। পুরুষরা শুধু চায় পালাতে। চায় নিত্য নতুন।

—আমি অবশ্য নিত্য নতুন চাই না মালা। তাহলে এই কয় বছর ধরে একটা উপন্যাস নিয়ে আমি পড়ে থাকতে পারতাম না।

—তা বটে।

—আর একটা কথা কি জান? আমি যে কোনোদিন এই ফিল্মের গল্প লিখব বা লিখতে পারব তা কল্পনাও করতে পারিনি।

—যাক লিখেছো তো?

—নেহাৎ বাধ্য হয়ে। তোমার চাপে।

—আমি একটা ভবিষ্যৎ বাণী করব।

—কি বলবে?

—আমি বলি যে, তোমার ঐ উপন্যাসখানা—যা তুমি লিখেছ গত ছ-বছর ধরে, তা আমাকে একবার দেখাবে?

—এখন দেখিয়ে কি হবে?

—কেন?

—কারণ এখন ত মাত্র তিন'শ পাতা লেখা শেষ হয়েছে।

—আর কত হবে ?

—আরো অন্তত তিন চারশ পাতা হবে।

—আমি আজকাল প্রচুর পড়াশুনা করি তাকি তুমি জান ?

প্রশান্ত হাসল।

বললে—তাই নাকি ? এটা সুখবর।

—না পড়াশুনা করেই বা কি করব ? স্টুডিও থেকে ফিরে কাজ তো কিছু নেই। তাছাড়া নানা দেশ বিদেশের সাহিত্য পড়ার ইচ্ছা বহুদিন ছিল। সুযোগ তো আগে পেতাম না।

—তা বটে।

—তাই তোমার আদর্শ উপন্যাসখানাও এতদিন কিছু করতে পারি নি। এখন একটু একটু করে চোখ বুলিয়ে যাব। তাহলে পাঁচ সাত দিনে পড়া শেষ হয়ে যাবে।

—তা হবে।

—যদি ভাল লাগে তাহলে ওটা থেকেও একটা ভাল ফিল্ম তৈরী করতে পার।

—তা বোধ হয় হবে না।

—কেন ?

—কারণ এরমধ্যে ঘটনা তো তেমন কিছু নেই। যা আছে তা শুধু উপন্যাসের খাতিরে। আসলে এটাকে আদর্শ সাহিত্য করে গড়ার চেষ্টা করছি।

—তাতে কি ? আদর্শ সাহিত্য কি সিনেমা নয় ? তাই ত ভাল হয়। পার্ক বার্কের গুড আর্থ কিম্বা ক্যাথারিন উইন্সারের 'ফর এভার এ স্টার' কি উঁচু সাহিত্য নয় ! এমিল জোনার 'নানার' সাহিত্য মূল্য কি কম ? 'গ্রোথ অফ দা সয়েল' কি ফিল্ম হয় নি। বিভূতি বাবুর পথের পাঁচালি কি বিশ্ব বিখ্যাত ছবি হয় নি।

ডিকেন্সের বইগুলি কি ভাল ছবি হয় নি?

—তা অবশ্য অস্বীকার করি না।

—তোমাদের একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে, সিনেমার গল্প শুনলেই নাক সিটকে বল, ওটা আবার কি? অবশ্য যদি সিনেমার জন্যই গল্প লেখা হয় তা উঁচু সাহিত্য হয় না প্রায়ই তা ঠিক—তবে যদি ভাল সাহিত্য হয়, তা থেকে ফিল্ম করলে তা খারাপ হবে না। এমন কি প্রবোধ বাবুর ভ্রমণ কাহিনী মহাপ্রস্থানের পথেও ফিল্ম হয়েছে। এবং তা ভালই হয়েছে।

প্রশান্ত বললে—তুমি দেখছি আজকাল অনেক পড়াশুনা করেছো।

—কি আর করব। তোমার ধারণা, লোক দেখানো বহিমিয়ান না হলে শিল্পী হওয়া যায় না। আমি বলি এটা ভুল ধারণা।

—ভুল নয়। তবে লোক দেখানো কিছুই ভাল নয়, তা ঠিক।

—নিশ্চয়। আদর্শ শিল্পীর পক্ষে যে আদর্শ স্যাডিষ্ট হতে হবে তার কোনো কথা নেই।

—এটা মন্দ বলোনি। তবে একটা কথা তো মানবে?

—কি কথা?

—বেদনা ছাড়া সৃষ্টি হয় না। কবিগুরু বলেছেন—

'বেদনায় আমার করিয়া বিদারিত,
মুহূর্তে নিল যে জন্ম, পরিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত।

—এটা মানবে তো?

মালা বললে—কবিগুরু তাহলে নিজেও স্যাডিষ্ট ছিলেন না। তবে দুঃখ ছিল তাঁর মনে। মনই তো সব কিছু। এছাড়া বাহ্যিক সবই লোক দেখানো।

প্রশান্ত উত্তর দিল না।

একটু ভাবল। তারপর বললে—আজকের দিনের দুঃখ যন্ত্রণাকে কি তুমি অস্বীকার কর?

মালা বললে—এই যুগের বশেষ দুঃখ যন্ত্রণা আবার কি? যন্ত্রণা বলতে যা অভাব তার বেদনা। কিন্তু অভাব কথাটাই তো আপেক্ষিক। কারও দেড়শো টাকাতেও মাসিক সংসার খরচ চলে না—কারও হাজারেও চলে না। বিশেষ করে সে যদি তোমার মত ইমপ্র্যাকটিক্যাল হয়।

—আমি ইমপ্রাকটিক্যাল?

—একদিন ছিলে বলে জানি। আজও যে তুমি কতটা প্রাক-টিক্যাল হয়েছো তা জানি না। যে লোক প্রাকটিক্যাল নয় সে আবার দুঃখ যন্ত্রণাকে কি ফোটাবে?

—কেন—কবি সুকান্ত কি—

মালা সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিল—চুপ কর। কাব্য আর উপন্যাস এক জিনিস নয়।

—তা অবশ্য সত্যি।

—তাইত বললাম। তুমি তাহলে কাল-পরশু ওটা নিয়ে এস। দেখব আমি।

—তাহলে তুমিই হবে আমার প্রথম পাঠক।

—তাইত হয়। অধিকাংশ সাহিত্যিকেরই ত স্ত্রী বা প্রেমিকা। হয় প্রথম পাঠক। তা তোমায় বেলাতেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

—তা ঠিক।

—কিন্তু সমালোচনা যা করবো তাহল ঠিক নিক্তির ওজনে। খারাপ হলে ভাল বলব না।—ভাল হলে খারাপ বলব না।

—ঠিক আছে, দেখা যাবে তুমি কেমন সমালোচক।

ওপার থেকে নৌকা আসছিল।

ঘাটে ভিড়ল। লোকজন নামল। মাঝি হাঁকতে লাগল—বেলুড় বেলুড়,······

মালা বললে—বেলুড়ে যাবে? অবশ্য নৌকাতে নয় গাড়ী করে।

—তা মন্দ নয়।

—ফেরা যাবে হাওড়া দিয়ে।

—কিন্তু রাত ত অনেক হবে– তাই নয়?

—তা হোক, তোমাকে বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে যাব।

—ঠিক আছে। তবে চল।

—দুজনে এসে গাড়ীতে উঠল। ড্রাইভারকে মালা বলল বেলুড়ে যেতে।

গাড়ী আবার চলল।

* * *

বেলুড় মঠে কাটল প্রায় আধ ঘণ্টা মত।

তারপর হাওড়া হয়ে গাড়ী মালার বাড়ীর সামনে যখন থামল তখন সাড়ে নটা বেজে গেছে।

মালা বলেল— চল, তোমাকে তোমার রাজপ্রাসাদে পৌঁছে দিয়ে আসি।

—না না আমি যেতে পারব।

—থাক, এত রাতে আর বীরত্ব দেখাতে হবে না। কিন্তু একটা কথা—

—কি বল?

—তুমি কি এখনও টিউশনি দুটো করছ?

—হ্যাঁ। তা না হলে চলছে কি করে?

—তা বটে। তা এখন থেকে তো চলার ভয় নেই।

—তা নেই।

তবে ও দুটো ছেড়ে দাও। যখন লেখক হবার সাধ তুমি করছ, তা পুরোপুরি ভাবেই কর।

—কিন্তু ছেলে দুটো দুঃখ পাবে।

—কেন ?

—এত সস্তায় এত ভাল টিউটার নাকি মেলে না।

—সস্তা ?

—তা নয়ত কি ? হায়ার সেকেণ্ডারী পড়ছে আর্টস নিয়ে। অথচ মাইনে দেয় মাত্র চল্লিশ টাকা করে। দুটোতে আশি টাকা পাই।

—তবে আজকালকার দিনে কম সত্যি।

—আর আমি বি. এ পাশ না করলেও আর্টস সাবজেক্ট যা পড়াই, তা নিশ্চই একজন এম. এ পাসের ছেলে হলেও হবে না।

মালা হাসল। বললে—তাহলে দুঃখ পাবেই। তা থাক, এবারে ও দুটো ছাড়।

—তা ছাড়ব। কিন্তু সারাদিন কাটবে কি করে ?

—পড়ে বা লিখে।

—কিন্তু সব সময় লিখতে ভাল লাগে কি ?

—না লাগুক। নিয়ম করবে—ভাল হোক মন্দ হোক রোজ অন্তত দশটি পাতা লিখবে, বেশী নয়। ওই দশপাতা তুমি গল্প উপন্যাস, রম্য রচনা, বেলে লেটার যা খুশি লেখনা কেন ?

—তাতে লাভ ?

—কাজটা মেথোডিকাল হবে। তাতে লেখা ভাল হবে। সাতদিন লিখলে না—একদিন বিশ পঞ্চাশ পাতা লিখে ফেললে তাতে লেখো ভাল হয় না।

—সত্যি ?

—নিশ্চয়। এটা আমারও উপলব্ধি—

—বেশ তাই করব।

—আর একটা কথা। তুমি যা লিখেছ সেই উপন্যাসটি আর এখন রোজ যা লিখবে তা দেখাবে।

—বেশ তাই হবে।

—আমার কথা একটু মেনে চল—আশা করি তাতে ক্ষতি হবে না।

—চেষ্টা করব।

—থাক ওঠ চল—তোমার রাজপ্রাসাদ একটু ঘুরে আসি। রাত প্রায় দশটা হল।

—হ্যাঁ, চল যাই।

দুজনে বেরিয়ে পড়ল। তারপর তারা গাড়ীতে উঠে এসে নামল সোজা প্রশান্তর সেই ছোট একখানা ঘরের ভাড়া বাড়ীর সামনে। হরিসাধন বেরিয়ে এল। প্রশান্তর সঙ্গে মাকাকে দেখে সে অবাক হল!

—আপনি যে!

—হ্যাঁ হার। তুমি এখনও আছ তো?

—ঠিক আছি। আমি না থাকলে বাবুকে কে দেখাশুনা করবে শুনি?

—তা ঠিক। আচ্ছা একটা কথা তোমাকে বলছি।

—কি?

—বাবু ভাল কাজ পেয়েছে। বাবুর কাজকর্ম একটু দেখাশুনা করবে। কাজ না করলে টাকা আসবে কোত্থেকে?

—তাত ঠিকই মা। বাবুতো কাজ সামান্য করছিলেন—তবে তাতে তো হয় না—

—এবারে হবে।

—মা বসবেন না? একটু চা করি?

—না আজ থাক হরিসাধন; আমি আর একদিন এসে খেয়ে যাব তোমার চা। এখন চলি, রাত অনেক হল।

তারপর প্রশান্তকে বলে—তুমি কবে আসছ?

—পরশু দিন—

—কটায়?

—কটায় তুমি ফ্রি থাকবে?

—বিকেলে এস। চারটে নাগাদ?

—তার মধ্যে কাজ শেষ হবে?

—তা হবে।

মালা বিদায় নিয়ে চলে যায়।

হরিসাধন বলে—তুমি কাজ পেয়েছ বাবু?

প্রশান্ত বলে—হ্যাঁ।

—কি কাজ?

—ফিল্ম স্টোরী একটা লিখেছি—আরও দু একটা লেখার চেষ্টা করছি।

—সত্যি?

—মিথ্যা বলে আমার লাভ কি বল। তাছাড়া কাজটা পেতাম না—তোমার মা-মণি সাহায্য না করলে।

—তা তো ভালই। তুমিও তো মা-মণিকে সাহায্য করতে। কিন্তু তোমার কি খেয়াল হল মা-মণির বাড়ী ছেড়ে এখানে এসে উঠলে।

—তাইত ভাল। আমার কাজ আর তোমার মা-মণির কাজ তো এক ধরনের নয়।

—তা ত জানি। তা পৃথক কাজ হলে কি একসঙ্গে থাকা যায় না।

—তা হয়ত যায়। কিন্তু হয়ত তখন আমার পৌরুষে আঘাত লেগেছিল!

—জানিনা বাবু ওসব। এখন চল, খেয়ে নেবে।

—ভাল কথা—এই চেকটা রেখে দে। কাল ব্যাঙ্কে ভাঙিয়ে নিতে হবে। ক্রশ চেক, আবার কারো সাহায্য নিতে হবে ভাঙাতে। বেয়ারার চেক তো ওরা দেয় না। আর আমার ব্যাঙ্ক একাউন্টস তো কবে বন্ধ হয়ে গেছে।

যত্ন করে সেটা বাক্সে তুলে রাখে হরিসাধন। তারপর প্রশান্ত খেতে বসে।

হরিসাধনের রান্না মাছের ঝোল আর ভাত যেন আজ অমৃত বলে মনে হয়।

খাওয়া শেষ করে সে অনেকদিন পরে আবার পুরানো উপন্যাস বের করে, তা নিয়ে পড়তে সুরু করে।

প্রায় ছ'মাস সে এই উপন্যাসের বেশী কিছু লেখে নি। বড় জোর পনের কুড়ি পাতা। তাও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে লেখে গেছে। প্রথম থেকে এটা কেমন ভাবে চলছে তা আর খুলে দেখে নি।

আজ দীর্ঘদিন পরে সে আবার প্রথম থেকে লেখা সব পাতাগুলো পড়তে লাগল।

আজ সে পড়ছিল অন্য ভাবে।

ঠিক যেন সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে। পড়া চলল এগিয়ে। পাতা দশকে সে পড়ল।

তারপর ভাবতে বসল।

তার ভাষার বা লেখার বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে একটা আছে ঠিকই—কিন্তু লোকের মনকে প্রথম থেকে টেনে নিয়ে যাবার ক্ষমতা কি আছে এর মধ্যে ?

তারপর সে পৃথিবীর বিভিন্ন খ্যাতনামা লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনার কথা ভাবতে লাগল।

তার সঙ্গে এই উপন্যাসটিকে সে মনে মনে তুলনা করল।

কিন্তু তবু সে সঠিক বিচার করতে পারলে না।

কখনও মনে হয় তার লেখা খুব ভাল, আবার কখনও মনে হয় উল্টোটা।

কিন্তু ওকে পাল্টে নতুন কিছু লেখার কথা সে কল্পনা করতে পারে না।

এই সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে প্রশান্ত ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত তখন প্রায় বারটা।

॥ আট ॥

পরদিন সকালে উঠে হঠাৎ নতুন একটা চিন্তা এল প্রশান্তর মনে।

প্রশান্ত ভাবল মালাকে সে এটা পড়তে দেবে। সে বরং নতুন একটা উপন্যাসে হাত দেবে।

কিন্তু কি উপন্যাস?

এটা ছাড়া অন্য কোনো উপন্যাসের কথা সে ভাবতেই পারল না তখন।

নতুন কোনো প্লট তার মাথায় নেই। তবু সে চেষ্টা করতে লাগল। দু এক পাতা লিখল। আবার তা কেটে দিল।

কিছুতেই তার মাথায় আর নতুন ভাল কোনো লেখা আসছে না।

এমন কেন হল।

তখন সে ভাবল একটা বড় গল্প লিখবে। বড় জোর ষাট-সত্তর পৃষ্ঠার মধ্যে।

সে গল্পটা আরম্ভ করল।

আজ তার হঠাৎ মনে হল যে গল্প লিখতে লিখতে তার ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গী যেন আগের চেয়ে অনেকটা অন্য ধরনের হচ্ছে।

ভাষার তীক্ষ্ণতা আছে ঠিক। তবে তার সঙ্গে আসছে ব্যথা আর হাহাকার।

পাতা পাঁচ ছয় লেখা হল। লেখাটা সে পড়ল। আগের চেয়ে অনেকটা ভাল লাগল তো লেখাটা!

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার লিখল দুটো পাতা।

ঘড়িতে দেখল দশটা বাজে।

হঠাৎ মনে পড়ল এ সময় সে ছেলেদের পড়াতে যায়। আর যাবে না সে। তবে ভদ্রতার খাতিরে তাদের কাছে খবরটা বলে আসা উচিত।

উঠল সে।

সোজা গেল ছাত্রদের বাড়ী। বললে—তোমাদের পরীক্ষা আর মাত্র তিন চার মাস বাকী। এখন ভাল ভাবে পড়াশুনা করতে হবে। তাই আমি এখন পড়ানো বন্ধ করছি। কারণ আমাকে বিরাট ঝামেলার মধ্যে পড়তে হয়েছে। এখন খেটে পড়াবেন, এমন একজন টিউটর রাখতে হবে। তা না হলে পাশ করতে পারবে না।

ছাত্ররা অনুরোধ করে।

বলে—আপনি খেটেই পড়াতেন স্যার।

—তা পড়াতাম। কিন্তু আর তো খাটতে পারব না। আর ফাঁকিও দিতে পারব না। তাই ছেড়ে দিচ্ছি।

—কিন্তু এখন তেমন শিক্ষক পাব কোথায়?

—তোমাদের ইস্কুলের শিক্ষককে রাখলে ভাল হবে।

—ওরে বাবা—সে তো মাসে ষাট-সত্তর টাকা হাঁকবেন।

—তাই দেবে। তাতে পড়া ভাল হবে। বুঝিয়ে শুঝিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে গেল এক বন্ধুর কাছে। তার একাউন্ট আছে ব্যাঙ্কে। সে ব্যবসা করে শিয়ালদহ অঞ্চলে।

অনেক দিন পরে হঠাৎ প্রশান্তকে দেখে সুবোধ বললে—হঠাৎ আজ মেঘ না চাইতেই জল।······কি খবর?

—খবর সামান্য।

—তার মানে।

—আমি একটা চেক পেয়েছি। সেটা ভাঙ্গিয়ে তুমি টাকাটা আমাকে দেবে। ক্রশ চেক তো।

সুবোধ বললে—ঠিক আছে। কটাকার চেক?

—দশ হাজার।

—দশ হাজার!

সুবোধ যেন আকাশ থেকে পড়ল। বললে—কি ব্যাপার? লটারি পেলে নাকি?

—সেই রকমই। ফিল্ম স্টোরী বিক্রি করেছি একটা।

—ভেরী গুড। তবে তো তোমার লাখ খুলে গেলো দেখছি প্রশান্ত।

—তা বটে। তবে ছবি মার খেলেই ত গেল।

—ডিরেক্টর কে?

—মিঃ রায়।

—তবে ছবি তো ভালই হবে আশা করি। দেখা যাক কি রকম হয়। আমরা নিশ্চয়ই প্রেস শোর কার্ড পাব। কিংবা পাশ।

—সেত পাবে। কিন্তু আমার ধারণা, ছবি বোধ হয় ভাল হবে না।

—কেন?

—কারণ তেমন ঘটনা সংঘাত নেই—যা সিনেমাতে প্রায় দেখা যায়।

—মিঃ রায় এমনি ছবিই বেশী করেন। তবে তা বেশ ভালই হয়।

—দেখা যাক কি রকম দাঁড়ায়।

—ঠিক আছে। তবে আমার ধারণা কিন্তু তোমার থেকে ভিন্ন। আমার ধারণা তোমার ভাগ্যটা পাল্টে গেল।

—তোমার ধারণা ঐ রকম উঁচু। জীবনে তুমি সব সময় সফলতা পেয়েছ—তাই এমনি ধারণা হয়ে গেছে তোমার।

—তা হবে হয়ত।

—যাক ভাই চেকটা রইল। কি নাগাদ টাকাটা পাবে বলোতো ?

—দিন দুয়েকের মধ্যে পাশ হবে। তারপর তোমাকে একটা বেয়ারার চেক্ দিয়ে দেব কেমন ?

—ঠিক আছে ভাই।

—এখন যদি অল্প সল্প কিছু দরকার হয় নিয়ে যেতে পার তুমি।

—না না তা দরকার নেই। দুদিন পরে হলেও চলবে। তোমার অসুবিধে হবে তাতে।

উঠে দাঁড়াল প্রশান্ত।

* * *

সুবোধের বাড়ী থেকে বাড়ী ফিরে এসে স্নান খাওয়া সেরে আবার বসল লিখতে।

হরিসাধন বললে—বাবু কি বের হবেন আজ ?

—না।

গল্পটা একবার পড়ে নিল যতটা লেখা হয়েছে। বেশ ভাল লাগল ওর ভেতরের হিউমারগুলো। হাস্যরসের মাঝ দিয়েও বাস্তব জীবনের অনেক কিছুকে আলোচনা করা হয়েছে গল্পটার মধ্যে দিয়ে। সবচেয়ে তার ভাল লাগল চরিত্র সৃষ্টি। গল্পের প্রতিটি চরিত্রই বেশ অভিনব ও বাস্তবতাপূর্ণ বলে তার মনে হল।

লিখতে লিখতে প্রায় বিকেল নাগাদ দেখল প্রায় বিশপাতা লেখা শেষ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রশান্ত।

একদিনে এতবেশী লেখা বোধ হয় আজ তার জীবনে এই প্রথম

একদিনে পুরো বিশ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ সাইজের কাগজ সে লিখেছে।

যাক, আজকের মত ডিউটি শেষ। প্রশান্ত এককাপ চা খেয়ে একটা ইংরাজী বই নিয়ে পড়তে সুরু করে দিল।

বিরাট বইখানা।

প্রায় চার'শ পৃষ্ঠা ছোটো ছোটো টাইপে ছাপা। পকেট সংস্করণের বই—দামটা একটু কম। সাড়ে চারশো পাতার বই-এর দাম মাত্র তিন টাকা।

তবে দাম কম হলেও লেখাটা অপূর্ব।

পড়তে পড়তে ওদের দেশের বাস্তব জীবনের এক সুন্দর পৃষ্ঠা যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

বইটা পড়তে পড়তে প্রশান্ত বিভোর হয়ে পড়ে। কোন দিক দিয়ে যে তার সময়টা কেটে যায় তা সে ভাল করে বুঝতেও পারে না।

* * *

পরদিন বিকেল পাঁচটা।

উপন্যাসের বিরাট বাঁধান খাতাটা আর নতুন লেখা গল্পটা হাতে নিয়ে সে যায় মালার সঙ্গে দেখা করতে।

মালা ফিরেছে চারটে নাগাদ। তখন সে গা ধুয়া সেরে একটা আটপৌরে কাপড় পরে চুপচাপ বিশ্রাম করছিল তার ঘরে।

প্রশান্তকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

—এস।

—দেরী হল একটু।

—তা হোক। নতুন কিছু লিখলে!

—হ্যা একটা বড় গল্প।

—শেষ হয়েছে ?

—হ্যাঁ, দুদিনেই শেষ।

—কত পৃষ্ঠার গল্প ?

—মোট ষাট পাতার মত লেখাটা।

—কৈ দেখি।

আগ্রহ ভরে মালা গল্পটা হাতে নেয়। তারপর বলে—দুদিনে এতবড় গল্প শেষ ?

—হ্যাঁ, বেশ ভাল লাগছিল লিখতে। তাই—

—ভালই হল। তোমার এটা কাগজে ছাপা হবার আগেই পড়া যাবে। আর উপন্যাসটা এনেছ।

—হ্যাঁ।

বাঁধান খাতাটা হাতে নিল মালা। ভাল করে সেটা উল্টে দেখে বললে—মোট দুশো সাঁইত্রিশ পাতা লেখা হয়েছে দেখছি।

—হ্যাঁ।

—ঠিক আছে।

এটা পড়তে দিন তিন চার লাগবে। কিন্তু একি। তোমার হাতের লেখা শেষের পাতাগুলিতে যেন তেমন ভাল হয় নি। এরকম লেখা তো তোমার নয়।

—না, তা নয়।

—তবে ?

—বোধ হয় একটু মন কম দিয়ে লিখেছি তাই লেখাটা এরকম হয়ে গেছে।

—তা হোক, আমি ঠিক বুঝতে পারব। যাক কি খাবে বলত ?

—শুধু চা বা কফি।

মালা কফি আনতে বললে রমাকে ডেকে। রমা চলে গেল।

আনমনে মাল্লা মোটা বাঁধান খাতাটা নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল।

হঠাৎ কি মনে হল। বললে—একটা বিশেষ কথা তোমাকে বলতে ভুলে গেছি।

—বিশেষ কথা ?

—হ্যাঁ—

—কি ব্যাপার ?

—ব্যাপার বেশী কিছু নয়। মিঃ রায় নিজে তোমার বইখানার চিত্র নাট্য করেছেন।

—তিনি ভাল করেন বুঝি ?

—চমৎকার। উনি ফিল্ম জগতে থাকলেও একেবারে ভিন্ন ধরনের লোক।

—তার মানে ?

—মানে তিনি হৈ চৈ পছন্দ করেন না। একেবারে খাঁটি আর্টিস্ট মানুষ। ফ্লোরে যান, কাজ করেন। কাজ ছাড়া কারো সঙ্গে আড্ডা পছন্দ করেন না।

—তুমি এত কথা কেমন করে জানলে।

—ফিল্ম লাইনে সবাই জানে।

—তুমি ওর কোনো ছবিতে কাজ করেছ ?

—আজ পর্যন্ত করিনি। তবে এবারে এ ছবিতে হয়ত সুযোগ দিতে পারেন।

—তুমি করবে ? নায়িকার রোল ?

—না।

—না কেন ?

—কারণ শিগ্‌গীরই ফিল্মে অভিনয় ছেড়ে দেব।

—হঠাৎ ?

—আর দরকার নেই। নায়িকার রোলে আর মানায় না আমাকে। আর সারা জীবন নাটক আঁকড়ে ধরে শেষে বদনাম কিনতে চাই না।

—এ বৈরাগ্য কি হঠাৎ ?

—না, গত বছর থেকেই মনে মনে এটা ঠিক করে বসে আছি। এই যে চারটে ছবিতে কাজ করছি এর পরে নতুন করে কোনো কণ্ট্রাক্ট আর নিই নি।

—তাহলে চলবে কি করে তোমার ?

—কেন তুমি ত আছ।

—আমি ?

—হ্যাঁ, তুমি।

—কিন্তু তুমি ত জান আমি অক্ষম।

—না, তা নয়। তুমি যাতে সক্ষম হয়ে ওঠো সে চেষ্টা করে তোমাক গড়ে তুলব।

—প্রথম ছবিই ত ফ্লপ করবে।

—মিঃ রায়ের কোনো ছবি ফ্লপ করে না। হ্যাঁ, যে কথাটা বলছিলাম শোনো।

প্রশান্ত তাকাল মালার দিকে।

মালা বললে··মিঃ রায় আজ বললেন, তিনি তোমার ছবির চিত্রনাট্য শুরু করেছেন। আসছে বুধবার তোমাকে স্টুডিওতে যেতে হবে।

—কেন ?

—তিনি তোমাকে চিত্রনাট্য শোনাবেন। যে কটা দৃশ্য লেখা হবে। তুমি এ্যাপ্রুভ না করলে কাজ করবেন না। এটা ওর রীতি।

—আমি চিত্রনাট্যের কি বুঝি ?

—যা বুঝবে তাতেই কাজ হবে। তুমি বুঝাবে যে তুমি অক্ষম নও।

প্রশান্ত হাসল।

বললে—তোমার কি উদ্দেশ্য বলত ?

—উদ্দেশ্য হল, তোমার হাতে সব ভার তুলে দিয়ে আমি এবার বিশ্রাম নেব।

তোমার প্রোডাকসনের কি হল ?

—সে পরে দেখা যাবে। সে নিয়ে এখনও কিছু স্থির আমি করিনি। কথাটা তোমাকে বলেছিলাম, যাতে তুমি কাহিনীটি তাড়াতাড়ি লেখ এই জন্যে।

—ঠিক আছে। তোমার কল্পনা শক্তি আছে স্বীকার করি মালা। তবে বাস্তব আর কল্পনা এক হয় না।

—কেন হবে না ?

—কারণ বাস্তব বড় কঠিন।

—ঠিক উল্টো।

—তার মানে ?

—তুমি জীবনে আঘাত পেয়ে পেয়ে পেসিমিষ্ট হয়ে উঠেছ। আমি তা হইনি।

—ঠিক বলছো ?

—নিশ্চয়।

—আচ্ছা দেখা যাবে—এই ছবিতেই বোঝা যাবে কি হয়।

—মালা কথা বলে না।

একটু থেমে কি যেন ভাবে। রমা কফি দিয়ে যায়।

কফি খেতে খেতে মালা বলে—তাহলে তুমি আসছ বুধবারে ?

—কটায়।

—বেলা দুটো থেকে তিনটের মধ্যে।

—ঠিক আছে।

—কফি শেষ করে প্রশান্ত উঠে দাঁড়ায়। মালা বলে—যেন বুধবারের কথাটা ভুলে বসে থেকো না। আর তোমার ওদুটো পড়ে কেমন লাগল ওদিন জানাব।

—ঠিক আছে।

প্রশান্ত বিদায় নিল।

॥ নয় ॥

আট দশ দিনের মধ্যে পুরো দশটি দৃশ্যের চিত্রনাট্য করে ফেলেছিলেন মিঃ রায়।

প্রশান্ত দেখে অবাক হল।

মিঃ রায় বললেন—আমি কাজ হাতে পেলে তা ফেলে রাখতে ভালবাসি না।

প্রডিউসার, এ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টার থেকে অনেকে সে দিন এসেছিলেন।

মিঃ রায় পড়তে শুরু করলেন।

প্রথম দৃশ্য থেকেই কাহিনী এমন জমে উঠল যে অবাক হল প্রশান্ত।

মিঃ রায়ের দৃশ্য বিভাগ সংলাপ বসাবার কৌশল ও চরিত্র সৃষ্টির নতুনতা প্রশান্তের কাছে অপূর্ব বলে মনে হল।

মোট দশটি দৃশ্য পড়ে তিনি যখন শেষ করলেন তখন সকলে দেখতে পেল, তাদের মনে একটা উদগ্র কৌতূহলের ছায়া।

—সামঞ্জস্যটা ঠিক আছে ত?

বললেন মিঃ রায়।

কথাটা তিনি বললেন প্রশান্তর দিকে চেয়ে। সে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

সকলেই স্বীকার করল—এটা একটা নতুন ধরনের কাহিনী এবং একটা অদ্ভুত সার্থক কাহিনী তৈরী হচ্ছে।

প্রশান্ত নিজেও অবাক হয়ে ভাবতে থাকে। সত্যি মিঃ রায়

যাদু জানেন বটে। কাহিনী, চরিত্রকে এবং ঘটনা-প্রবাহকে তিনি এমন ভাবে টেনে নিয়ে গেছেন যে তা একটা আদর্শ ছবির উপযুক্ত।

—প্রডিউসার ভদ্রলোক তো আনন্দে আত্মহারা।

তিনি বললেন—আমি শীঘ্রই স্যুটিং শুরু করে দেব মিঃ রায়।

মিঃ রায় বললেন—এখনও দুটি সপ্তাহ লাগবে এর চিত্রনাট্য শেষ করতে। যাক্, এ পর্যন্ত সবাই ঠিক এ্যাপ্রুভ করছেন তো?

—হ্যাঁ, নিশ্চই।

সকলে একবাক্যে বলে ওঠে।

প্রশান্ত বলে—আমার আর শোনার কি আছে? আমি নিজে এত ভাল চিত্রনাট্য করতে পারতাম না।

মিঃ রায় বললেন—তা ঠিক। যিনি কাহিনী লেখেন, তিনি চিত্রনাট্যকার হতে পারেন না। দুটোতে অনেক পার্থক্য। তবে অবশ্য অনেকে দুটোই পারেন। তাদের সংখ্যা অবশ্য খুব বেশী নয় এটা বলা চলে।

প্রশান্ত বললে—তাহলে আজ উঠি।

—এক মিনিট। —বললেন মিঃ রায়। একটা কথা বলা হয়নি এখনও। আমি ছবিটাতে আগে চূড়ান্ত একটা ট্রাজিডির ভাব এনে শেষে কমিডিতেই শেষ করতে চাই।

—তা মন্দ নয়।

প্রডিউসার বললেন—আপনি যা খুশী করুন আমি তাতেই রাজী। মোট কথা ছবি বেশ ভালই জমবে, তা বুঝতে পারছি।

মিঃ রায় বললেন—কিন্তু ছবিতে আমি গানদেবার পক্ষপাতী, নই।

প্রডিউসার বললেন—তাহলে কাটতি বাড়বে কি করে? খরচ যে বেশ পড়বে।

—তা পড়ুক।

—কিন্তু দু একটা গান যে লোকে চায়।

—তা ঠিক, সেটাও ভাবছি। কিন্তু বড় জোর একটা কি দুটো গান দেয়া চলে। একটা কলেজ ফাংশানে আর একটা মাঝামাঝি; তবে তাও জোর করে ঢোকানো হয়ে যায়।

—বেশ, করুন, যা ভাল মনে করেন।

—আমার মতে গান বেশী দিলে ছবির গ্রাভিটি কমে যায়। বিশেষ করে এ ধরনের সিরিয়াস গল্পে।

—তবে একটা কি দুটোই থাক।

—ঠিক আছে। গান দুটোর একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত আর একটা আধুনিক হবে—তাও ক্লাসিক্যাল টাচ্ থাকবে। তা না হলে সিরিয়াসনেস নষ্ট হবে।

কেউ তাতে আপত্তি জানাল না।

মিঃ রায় মালাকে বললেন—আপনার মতামত তো শোনা হলো না। আপনি কি কাজ করবেন?

মালা আপত্তি জানাল। বললে—আমি ফিল্ম লাইন ছেড়েই দিচ্ছি। তাই আর—

—তাহলে সিরিয়াস হিরোয়িন পাই কোথা? তবে নিউ ফেস ট্রাই নিতে হবে।

প্রডিউসার বললেন—নিউ ফেস হলে লোকে নেবে কি? মানে বক্স অফিস—

—না না। আমি বক্স অফিস চিন্তা করে আজে-বাজে নামকরা নায়িকাকে টেনে আনতে চাই না। সেই টাকাটা বরং অন্যদিকে খরচ করলে ছবির আকর্ষণ বাড়বে। তবে যদি নেহাৎ না পাই তবে দেখা যাবে।

—ঠিক আছে।

—বক্স অফিস শুধু নায়িকার নামে চলে না। আর নতুন নায়িকা পেলে পাবলিসিটি দিয়ে বক্স অফিসকে টেনে নেয়া যায়।

— তা ঠিক।

—তাই দেখেছেন, আমি অধিকাংশ ছবিতেই নতুনদের চান্স দিয়েছি।

—তা তো দেখেছি।

—তবে আর আপত্তি নেই। আপনি নতুন নায়িকার জন্যে বিজ্ঞাপন দিন।

—ঠিক আছে।

প্রশান্ত আর মালা উঠে দাঁড়াল। মিঃ রায়ও উঠে চলে গেলেন।

*　　　　*　　　　*

বাড়ী ফিরে আজ মালাকে খুব সিরিয়াস মনে হলো প্রশান্তের কাছে।

মালা বললে—তোমাকে আজ একটা কঠিন কথা বলবো। রাগ করবে না, বলো?

—বলোই না।

—তোমার এই বিরাট উপন্যাসটি আমি বেশ মন দিয়েই পড়েছি। তবে তাতে খুব আনন্দ পাইনি।

— কেন?

—কেন তা বইটা খুলে দেখ। তোমার এই ষাট পৃষ্ঠার গল্প যতটা ভাল লাগল—এটা তাও লাগেনি।

—কেন?

—কারণ তোমাকে দেখাচ্ছি

মালা খাতা খুলল।

প্রশান্ত হেসে বললে—তুমি একজন রীতিমত ক্রীটিক হয়ে উঠলে ?

—দেখো লিখতে আমি পারি না ঠিকই। তবে লেখাতে ভালই পারব এই পাঁচ বছরে অন্তত হাজার খানেক কি তারও বেশী বই পড়েছি।

—ঠিক আছে। তোমার কথাটা নিয়ে চিন্তা করবো। আজ তা হলে উঠি।

—আর একটা কথা—

—বল।

—এটা আদেশ নয়, অনুরোধ। তুমি হঠাৎ খুব বেশী কাজ করার চেষ্টা করো না। তাতে লেখা খারাপ হতে বাধ্য। শরীরও খারাপ হবে।

—এ কথাটা অর্থহীন।

—কেন ?

—লেখার ভূত সব সময় এসে ঘাড়ে চাপে না। তবে যখন চাপে সহজে ছাড়তে চায় না।

—তা মানি।

—তাই একথা বলতে পারি যে, জোর করে কিছু আমি লিখবো না। তবে লেখার মুড্ এলে কাজ করে যেতেই হবে আমাকে।

প্রশান্ত উঠলো।

মালা বললে—তোমার এ উপন্যাসটা শেষ হলে মন্দ হবে না—তবে সব মিলে মোট আড়াইশো পাতা বড় জোর। তার বেশী হলে এই যে পটভূপ্রেক্ষিতটা নিয়েছো, তাতে গল্প গেঁজিয়ে যাবে।

—প্রশান্ত হাসল।

বললে—চেষ্টা করব।

—এটা কোনও প্রকাশককে যদি কখনো দাও, তা হলে এর একটা সংক্ষিপ্ত কাঠামো লিখে রেখো। চিত্র কাহিনী হিসেবে মন্দ হবে না। তবে মিঃ রায় যেটা করছেন তার মত বৈচিত্র্যময় নয়!

প্রশান্ত সত্যি চিন্তিত হলো। যে উপন্যাসকে সে আদর্শ উপন্যাস করতে চেয়েছিল, তার চেয়ে মিঃ রায়কে দেওয়া কাহিনী হলো ভাল।

অথচ সে তখন সেটা মনেপ্রাণে ঠিক অস্বীকার করতে পারছে না।

মালার বুদ্ধি এখন অনেক বাস্তব অনেক প্রখর হয়ে উঠেছে, তা সে মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো।

॥ দশ ॥

পরদিন সকালে উঠে প্রশান্ত অবাক।

একজন অবাঙালী ভদ্রলোক আর তাঁর সঙ্গে দুজন বাঙালী ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন গাড়িতে করে।

হরিসাধনকে দেখে বললে—এটা কি প্রশান্ত বাবুর বাড়ি?

হরিসাধন প্রশান্তকে ডেকে দিল।

প্রশান্ত বেরিয়ে এলো।

অবাঙালী ভদ্রলোক ভাঙা ভাঙা বাংলা বলেন। তবে তা বোঝা যায়।

তিনি বললেন—আমি এলাম স্যার আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

—কেন?

—বিশেষ দরকার।

—আমাকে?

—হ্যাঁ, আমরা খবর পেলাম মিঃ রায় আপনার একটা কাহিনী নিয়েছেন

—হ্যাঁ।

—সেটা খুব ভালই হয়েছে শুনলাম।

—কার কাছে শুনলেন?

—স্টুডিয়ো মহলে আমাদের অনেক স্পাই থাকে। খবর ঠিক আসে।

—তা কি হলো?

—ইনি হলেন আমার ডিরেক্টর মিঃ পাকড়াশী। আমার নাম নাথুলাল শেঠ। আমিও একজন ফিল্ম ব্যবসায়ী। একটা ভাল ছবি

করবো। একটা ভাল খুব জমাট কাহিনী লিখে দিন বাবু। রূপেয়া যা লাগে—

—আমার ঠিকানা পেলেন কি করে?

—কেন? আপনিত কন্‌ট্রাক্ট সই করেছেন। তাতে ত ঠিকানা লেখা ছিল। ঐ সাদার্ন স্টুডিওর মণ্টু বাবু তখন ছিলেন। তিনিই ঠিকানা দেখে টুকে রাখেন। তিনিই দেন আমাকে।

—তা ভাল। আমার ঠিকানা বলতে ত একটা ছোট ঘর মাত্র।

—ও বাৎ ছেড়ে দিন। লিখতে লিখতে বড় বড় মোকান বনে যাবে। আপনি ভাল রাইটার—

—ভাল মন্দ জানি না। তবে লিখে দিতে পারি একটা কাহিনী।

—বেশ তো। ক'দিন লাগবে?

—দিন পনেরো।

—ঠিক আছে। তা হলে এই দু'হাজার টাকা এ্যাডভান্স থাকলো—

বলে ভদ্রলোক একতাড়া নোট এগিয়ে দিল।

—রেট ঠিক হলো না। অথচ—

—কত চান?

প্রশান্ত দুম্ করে বলে ফেলল—বিশ হাজার।

—ওরে বাপ। এত আমি পারবো না।

—তবে?

—দশ হাজারে ত লিখেছেন আগে। ওটাও তাই করুন।

—না, পনেরো—

—ঠিক আছে। কিন্তু খুব ভাল হওয়া চাই। কেমন?

—আচ্ছা।

—ভদ্রলোককে একটা দু'হাজার টাকার রশীদ লিখে দিল প্রশান্ত।

তিনি ভূঁড়ি দুলিয়ে তার ডিরেক্টরদের সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে বসলেন।

প্রশান্ত বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল।

*　　　*　　　*

মিনিট পনেরো চুপচাপ বসেছিল প্রশান্ত।

হরিসাধন এসে চা দিয়ে গেল।

চা খেতে খেতে প্রশান্ত বললে—সব শুনলি তো ?

—হ্যাঁ শুনলাম, দেখলাম তোমার ভাগ্য যে ফিরে গেল দাদাবাবু।

—তা তো গেল। কিন্তু কি মাথামুণ্ডু এখন লিখবো। মালা দেখি পথে বসাবে আমাকে। আমি ভয় দেখাবার জন্যে বেশী টাকা বললাম। তাতেই রাজী....

—ঠিক আছে। লেগে যাও...

—না, আগে মালাকে খবরটা দিয়ে আসি। তুই বাজারে যা –

বলে একটা একশো টাকার নোট তার হাতে তুলে দিল প্রশান্ত।

রাস্তায় নেমেই সে একটা ট্যাক্সি থামালো। তাতে উঠে বসলো।

ট্যাক্সি ছুটল মালার বাড়ির দিকে।

তখন সাড়ে সাতটা। মালা সবে বসে চা খাচ্ছে। এমন সময় ঝড়ের মত ঢুকলো প্রশান্ত।

—একি তুমি ? এতো ভোরে ?

—হ্যাঁ, সর্বনাশ—

—কি হলো ?

—মিঃ পাকড়াশী—সঙ্গে ভুরিওয়ালা শেঠ—উঃ কি ভয়ংকর ব্যাপার।

—তার মানে ?

—সব কথা খুলে বললো প্রশান্ত। তারপর বললো—এ মহাঝামেলা।

—ঝামেলা নয়, এই হলো তোমার কাজের শুরু।

—কেন?

কারণ সবাই জানেন যে, মিঃ রায় বাজে লেখা নেন না, বাজে ছবি করেন না।

—কিন্তু এখন কাহিনী হঠাৎ পাই কোথায়?

—তোমাকে তো বলেছি।

—কি বলেছো?

—তোমার বড় উপন্যাস তো শেষ হয়নি?

—না।

—তাহলে ঐ ষাট পাতার গল্পটাকে আরও বাড়িয়ে দাও। ফিনিশিং-এ একটা স্টাণ্ট থাকবে। বাস, ভালো ফিল্মের কাহিনী হবে।

—কিভাবে বাড়াবো?

—তা আমি কি জানি? সে তুমি বুঝবে।

—ঠিক আছে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কি হবে?

—কেন হবে না! তোমার তো ভংল লিখতে হবে না। এটা পত্রিকায় দিয়ো না। ব্যস, এর সঙ্গে আর গোটা চল্লিশ পাতা লিখে ফেলো।

—তা হলেই হবে?

—নিশ্চয়।

—যদি পছন্দ না করে?

—আলবৎ করবে। তবে পরের দিকে ঘটনা একটু বেশী এনো। ওরা মিঃ রায় নন। জান তো, একটু হিন্দী ঘেষা রুচি।

—বাবা, হিন্দী ছবি তো সাংঘাতিক।

—না, তা করতে হবে না। একটু ঘটনা থাকবে ঘন ঘন আর শেষে স্টান্ট।

—কিন্তু তাতে আমার ষাট পাতা গল্পটা তো মাঠে মারা যাবে।

—না, তা যাবে না।

—কেন ?

—পত্রিকাতে যখন দেবে, ঐ ষাট পাতাই দেবে। শেষের চল্লিশটা পাতা থাকলো শুধু সিনেমার জন্য।

—তা হতে পারে বটে। তোমার মাথা দেখছি ব্যবসাতেই ভালো খোলে মালা।

—তা তো খুলবেই।

বলে মালা হাসে।

—তা হলে উঠি—

—না, না, চা খেয়ে যাও।

অগত্যা প্রশান্তকে বসতে হয়।

॥ এগারো ॥

দেখতে দেখতে পুরো দুটি মাস কেটে যায়। এই দুটি মাসে প্রশান্ত তার বড় উপন্যাসটি নতুন ভাবে শেষ করেছে।

তা ছাপা হয়ে বাজারে জোর বিক্রি হচ্ছে।

মিঃ রায়ের ছবিটা শেষ হয়ে তা বাজারে রিলিজ হয়ে গেছে।

জোর হিট হয়েছে সেটা।

মিঃ শেঠের সঙ্গে কনট্রাক্ট হয়ে গেছে। তিনিও স্যুটিং শুরু করেছেন।

তা ছাড়া আরো দুটো ফিল্ম স্টোরীর চুক্তি হয়ে গেছে এর মধ্যে।

সকালে বিকালে প্রকাশকদের আর অন্যান্য কাজ অকাজের লোকের আনাগোনার বিরাম নেই।

কয়েকটা পত্রিকা তার জীবনী ছাপবে বলে ইন্টারভিউ নিয়ে গেছে।

সব মিলিয়ে একটা হৈ হৈ কাণ্ড। যার কিছুই কয়েক মাস আগে প্রশান্ত ভাবতে পারত না।

সেদিন বিকেলে তার কাছে একটা কার্ড এলো।

চারটি সিনেমার ফ্রি পাশ। প্রশান্ত তার নিজের প্রথম ছবি দেখতে যাবে। তারই নিমন্ত্রণ

সেদিন বিকেল ছটার শোর কার্ড।

প্রশান্ত গেল মালার বাড়ীতে। সে বাড়িতেই চুপ করে বসেছিল। তার দুটো ছবি শেষ হয়ে গেছে। অন্য দুটো অর্ধেক শেষ।

মাস দুয়েকের মধ্যে তার কাজ শেষ হবে। নতুন আর কোনও কাজ সে হাতে নেয় নি।

প্রশান্ত ডাক দিল—মালা—

—এই যে এসো—

—চলো ফিল্মটা দেখে আসি।

—কার্ড পেয়েছো?

—হ্যাঁ, আজই ছটার শোতে যেতে হবে।

—তাই নাকি? ঠিক আছে, চলো!

—সবাই তো বলেছে যে, ছবি নাকি খুবই ভাল হয়েছে। তাই ভাবছি—

—ভাল হবেই। আগেই বলেছিলাম।

—কি করে জানতে যে—

—দেখ জীবন অবলম্বন করে যা লেখা হয়, তা খারাপ হতে পারে না।

—তা ঠিক।

—লেখকরা সব সময়ই চায় ভাল লিখতে। কিন্তু কল্পনা থাকে বেশী তাতে।

—তা তো থাকেই।

—তাই কল্পনা কম থাকলেও বাস্তব বেশী থাকলে তা ভাল হয়। নিজেই দেখবে।

দুজনে নেমে এসে গাড়িতে উঠল

* *

শো ভাঙল রাত প্রায় নটায়।

প্রশান্ত নেমে এলো। সঙ্গে মালা।

—কেমন দেখলে? —বললে মালা।

—খুব ভালো।

—এমনটা হবে ভাবতে পেরেছিলে ?

—না।

—কিন্তু আমি জানতাম।

—তবে এর জন্যে ক্রেডিট মিঃ রায়ের।

—তা আছে। তবে কাহিনীতে কাঠামোটাও একটা আসল জিনিস তো ?

—তা বটে।

—এবার একটা কথা বলব ?

—বল।

—এই যে চিত্র কাহিনী একে একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের রূপ দাও। সম্পূর্ণ লিখলে, মোট প্রায় আড়াইশো তিনশো পাতা হবে।

—তা মন্দ নয়।

—তুমি দেখবে, তোমায় প্রথম উপন্যাস থেকে এটা অনেক ভাল হবে।

—কেন ?

—তা তো আগেই বললাম। এটা যে সম্পূর্ণ জীবন নিয়ে লেখা।

—তা অবশ্য ঠিক।

—এর তুলনায় তোমার পরবর্তী একটা কাহিনীও ঠিক এতভালো হবে কিনা সন্দেহ !

—তবে উপায় ?

—উপায় আছে। মন দিয়ে লিখে যাও। ভাল রচনা যে কখন আসে লেখকের মনে বা কলমে তা সে নিজেও জানে না।

—মালা হাসে।

তারপর বলে—একটা কথা বলবো ?

—বল।

—কাল বেড়াতে যাবে ?

—কোথায় ?

—গাড়ী চেপে বাইরের দিকে কোথাও। তুমি আর আমি।

— কতদূর যেতে চাও ?

—ধর, ধানবাদ।

—তাতে লাভ ?

মাঝে মাঝে বেড়ালে মুড্ আসে। লিখতে সুবিধা হয়।

—বেশতো।

—আমি তবে খাবার করে রাখব।

—কিন্তু ওখানে গিয়ে উঠবে কোথায় ?

—হোটেলে।

—সে কি ভাল লাগবে ?

—নিশ্চয় লাগবে। একদিন হোটেলে থাকলে কি এমন ক্ষতি ? আবার পরশু ফিরব।

—কিন্তু তুমি সত্যি ফিল্ম লাইন ছাড়লে মালা ?

—হ্যাঁ, মানে মানে ছাড়লাম। তা না হলে দু চার বছর পরে ছাড়তেই হতো। তাতে সম্মান থাকতো না।

—তা বটে।

—এখন তাই সম্মান নিয়েই বিদায় নিলাম।

কথাটা বলে মালা হাসতে লাগল।

ওকে এমন প্রাণখোলা হাসি হাসতে প্রশান্ত ইদানীং দেখেনি বিশেষ।

*　　　　*　　　　*

পরদিন আটটা।

গাড়ি ছুটে চলছিলো গ্রাণ্ডট্রাংক রোড দিয়ে।

প্রশান্ত বললে—মালা, ফিল্ম ছাড়লে তুমি—এবার কি করবে?

—চাকরি করবো।

—চাকরি?

—হ্যাঁ।

—কোথায়?

—কেন তোমার কাছে?

প্রশান্ত হাসে। বলে, তোমার এত মাইনে কি আমি দিতে পারব?

—পারবে না?

—কি করে দেবো?

—বেশ তো—তা হলে এক কাজ করো।

—কি কাজ?

—তুমি যা পাবে তাই আমাকে দেবে? এর বেশী চাই না। রাজী আছো?

প্রশান্ত বলে—তুমি সত্যি আমাকে আবার নতুন মানুষ করেছো।

—হ্যাঁ, কিন্তু এর জন্য আমাকে কম সাধনা করতে হয়নি।

—তা বটে!

—প্রশান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

-সমাপ্ত—